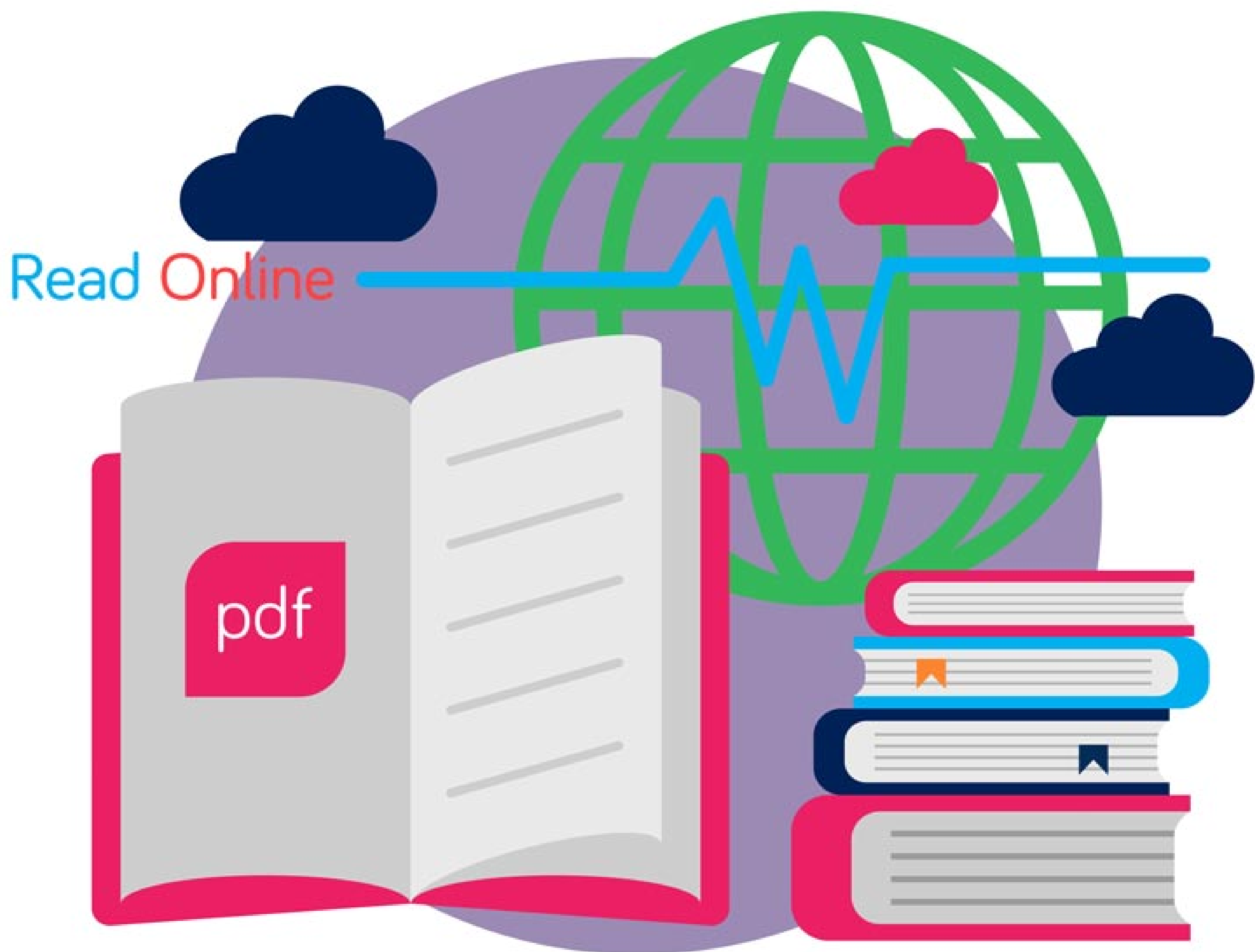



E-BOOK

আনিসুল হক



# মন+হৃদয়

# ভূ | মি | কা

২০০৮ সালের বইমেলায় আমার একটা উপন্যাস বেরিয়েছিল 'ফিরে এসো, সুন্দরীতমা' নামে। গল্পটা ছিল এক মাদকাসক্ত তরুণীকে নিয়ে। অনেকেই বইটা পছন্দ করেছিলেন। তবে কারও কারও আপত্তি ছিল শেষটা নিয়ে। তরুণীটি কেন ফিরে আসতে পারল না। তাহলে কি মাদকাসক্তরা সুস্থ জীবনে ফিরে আসতে পারবে না? অনেকেই তো সুস্থ হয়। আমি কেন আমার গল্পে সেটা দেখালাম না? ওই গল্পের শেষটা তবু আমি বদলাইনি। কিন্তু এরপর আরেকটা গল্প লেখা জরুরি হয়ে পড়ে। 'মন+হৃদয়' সেই গল্প। এই গল্পের প্রধান চরিত্র, আমরা আশা করি, অন্ধকার থেকে আলোয় ফিরে আসতে সক্ষম হবে।

আরেকটা গল্প থাকল এই বইয়ে। চৈত্র শেষের ভালোবাসা। কেমন যে লাগবে পাঠকদের, সেই ভয় কবে কোন লেখকের থাকে না? আমার আবার সেটা একটু বেশি।

ধন্যবাদ।

আনিসুল হক
জানুয়ারি ২০০৯



# মন+হৃদয়

একটা বাচ্চা মেয়ে, মেয়েটার নাম আলো, একটা গাছ ধরে কাঁদছে। কাঁদছে আর বলছে, 'গাছভাই গাছভাই, চাচা আমারে স্কুল ছাড়াইতে চায়, আমারে ঢাকায় লইয়া যাইয়া গার্মেন্টসের কামে লাগাইতে চায়। আমি যাইতে চাই না, কিন্তু এই কথাটা আমি তারে কই নাই, আমরা যে গরিব, আমার বাপ-মায়ের যে আমারে পড়ানোর টাকা নাই, আমি গার্মেন্টসে কাম করলে যে দুইটা টাকা আইব, তাই আমি ঠিক করছি চাচার লগে যামু। কিন্তু আসলে আমি যাইতে চাই না।' এই কথা বলতে বলতে বাচ্চা মেয়েটা টপটপ করে চোখের জল ফেলতে লাগল। তারপর শুরু করল ফুপিয়ে ফুপিয়ে কান্না।

সুমনা টেলিভিশনের সামনে বসে নাটক দেখছিল। এই দৃশ্য দেখে সুমনার চোখ ভিজে এলো। তারপর সেও কাঁদতে শুরু করে দিল। প্রথমে ভেবেছিল সে কান্নাটা সামলাতে পারবে। কিন্তু না। কান্না কিছুতেই বাঁধ মানছে না। ভাগ্যিস ঘরে সুমনা একা। আচ্ছা তাহলে সে বরং প্রাণভরে কাঁদুক। কেঁদে মনের মেঘভার খানিকটা লাঘব করুক।

এমন না যে সুমনা কোনো কিশোরী। সে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজি বিভাগ থেকে পাস করে সেই বিভাগেই শিক্ষক হিসেবে জয়েন করেছে। আর ইংরেজি বিভাগে পড়ার কারণে শেক্সপিয়রের ট্রাজেডি থেকে শুরু করে গ্রিক ট্রাজেডি পর্যন্ত কত ট্রাজেডিই তাকে পড়তে হয়েছে। বাংলাদেশ টেলিভিশনের নাটকের সামান্য আবেগঘন দৃশ্য তাকে ঘায়েল করতে পারবে— এমনটা হওয়ার কথা নয়। এই মেয়ের মন হওয়ার কথা লোহার মতো শক্ত। কিন্তু বাস্তবে তা হয়নি। মেয়ের মন হয়েছে আইসক্রিমের মতোন নরম। একটুতেই গলে পানি হয়ে যায়। সুমনা তার চোখের পানি সামলাতেই পারছে না।

এই সময় তার বাবা আবদুস সাত্তার সুমনার ঘরে প্রবেশ করলেন। ঘরটা সুমনার একান্ত নিজের। দেয়ালে নীল রং। দেয়াল-জোড়া বইয়ের তাক। তাতে দেশি-বিদেশি নানা বই। এক পাশে একটা ছোট্ট টেলিভিশন, আর তার নিচে গান শোনার যন্ত্র। মেয়ের পড়ার টেবিলে কম্পিউটার, এলসিডি মনিটর। আরেকদিকে ওয়ার্ড্রব, আয়না লাগানো ড্রেসিং টেবিল। একদিকে একটা ছোট্ট খাট। ঘরের মধ্যে জয়নুল আবেদিনের আঁকা একটা বালিকার মুখচ্ছবি। মূলছবি নয়। পোস্টার।

সাত্তার সাহেব বললেন, 'এই মন। কাঁদছিস কেন। মন?' বাবা সুমনাকে মন বলে ডাকেন।

'বাবা! কই কাঁদছি না তো'—বলে মন আরো জোরেই কেঁদে ফেলে। কান্নার গমকে তার শরীর ফুলে ফুলে উঠছে।

'কী হয়েছে। সাংঘাতিক কিছু!' আব্দুস সাত্তার সাহেব উদ্বিগ্ন স্বরে বললেন।

'হুঁ।'

'মন। সাংঘাতিক কিছুটা কী? বলবি তো।'

'টিভিতে। ওই বাচ্চা মেয়েটাকে স্কুল থেকে ছাড়িয়ে নিচ্ছে। ওর খুব মন খারাপ। মন খারাপ করে ও কাঁদছে।'

'সেইটা দেখে তুই কাঁদছিস। হেই পাগলি! পাগলি কোনোদিন বড় হবি না!'

'আরে মেয়েটা এত ভালো অভিনয় করল। দেখলে তুমিও কাঁদতা।'

'তাহলে তো না দেখাই ভালো। বুড়া মানুষকে কেউ যদি কাঁদতে দেখে, কী সিনটাই না ক্রিয়েট হবে। বল তো!'

'হুঁ। বাবা, কান্নার আবার ছেলেবুড়া কি। কান্না পেলে কাঁদতে হবে না। তবে তুমি আবার নিজেকে যতটা বুড়া ভাবছ, ততটা বুড়া তুমি হওনি।'

'তা হইনি। আসলে আমার বয়স তো কমছে। এখন তুই আমার মা। আর আমি তোর ছেলে। আমার মায়ের তো আবার দয়ার শরীর। সব কিছুর জন্যেই তার মায়া! এই মেয়েটা যে কোন ঘরে যাবে!'

'বাবা, আমি বিয়ে করব না।'

'সেই! বুড়াছেলের খেদমত করতে হবে না!'

'দেখো আমি সারাটা জীবন তোমার টেক কেয়ার করব।'

আবদুস সাত্তার সাহেব হাসিমুখে মেয়ের ঘর থেকে বের হলেন। কিন্তু তার

বুকের ভেতরটা কেমন মোচড় দিয়ে উঠছে। এই মেয়েটা এত নরম। এত আবেগপ্রবণ। এই ধরনের মানুষের জন্যে এই জগত নয়। পৃথিবীটা একটা কঠিন জায়গা। ভালো মানুষের জন্যে এই পৃথিবীতে সাজানো আছে নানা ধরনের কঠিন ফাঁদ। আহা, মেয়েটা যেন ভালো থাকে। তার চোখে জল এসে যায়।

তাহলে দেখা যাচ্ছে আবদুস সাত্তার সাহেবও কম আবেগপ্রবণ নন। তার মেয়ে আসলে তার মতই হয়েছে। এই মেয়ে এই বিরূপ পৃথিবীতে প্রায় একা। বাবা ছাড়া তার আর কেইবা আছে। খুব ছোটবেলায় তার মা সড়ক দুর্ঘটনায় মারা যান।

আবদুস সাত্তার সাহেব তখন আমেরিকায়। সানফ্রান্সিসকো থেকে তিনি গাড়ি ড্রাইভ করে লস এঞ্জেলেসের দিকে আসছিলেন। পাশে সুমনার মা সাবিহা ছিল। সুমনা বসা ছিল পেছনের সিটে। সবারই সিটবেল্ট বাঁধা ছিল। গাড়ি চলছিল ৭০ মাইল বেগে। হঠাৎই সামনের গাড়ির চাকা ফেটে যায়। সেটা আটকে গেলে তাদের গাড়ি গিয়ে পেছন থেকে সেটাকে জোরে আঘাত করে। এরপরে সাত্তার সাহেব আর কিছু বলতে পারেন না। আমেরিকান বিমানবাহিনীর হেলিকপ্টার তাদের উদ্ধার করে। দুইদিন পরে জ্ঞান ফিরলে তিনি দেখতে পান তার পাশে তার তিন বছর বয়সী মেয়েটার মুখ। তার ধরে জান ফিরে আসে। কিন্তু সাবিহাকে তিনি আর জীবিত দেখেননি।

মেয়েটাকে মানুষ করার জন্যেই, ভালো রাখার জন্যেই তিনি আর বিয়ে করেননি।

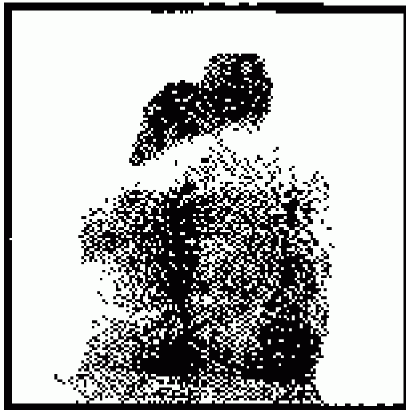
সেই সুমনা! তিনি ডাকেন মন বলে। এই বিশাল পৃথিবীতে একটা বিন্দুর মতো মেয়েটা একা! হে আল্লাহ, তুমি আমার মেয়েটাকে রক্ষা করো। ভালো রেখো। ওকে তুমি কোনো দুঃখ দিও না।

অন্যদিকে সুমনা ওরফে মন ভাবছিল তার বাবার কথা। এই বাবাটার সে ছাড়া আপন বলতে আর কেউই নেই প্রায়। বাবাটার তার বড় বেশি মায়ার শরীর। সে ছাড়া তাকে কে দেখে রাখবে! কে রাতের বেলা ওষুধের স্টিপ দেখে বলবে, বাবা, তুমি কিন্তু আজকের ওষুধটা খাও নাই। এই বাবা তাকে বড় করবার জন্যে আর কখনও বিয়ে করলেন না। বাবাটাকে ছেড়ে সে কোথায় যাবে। গিয়ে সেইবা থাকবে কোথায় আর বাবাই বা থাকবেন কী করে।

সুমনার চোখে আবার জল চলে আসে। মায়া! মায়া! দুনিয়াটা একটা আশ্চর্য মায়ায় ভরা জায়গা!

মন বারান্দায় এসে দাঁড়াল। তার এই দোতলার বারান্দা থেকে আকাশ দেখা যায়। বারান্দার ওই পাশের বাড়িটা একতলা। সেটার সামনে অনেকটা জায়গা। তাতে নানা ধরনের গাছ। একটা লম্বাটে কদম গাছও আছে। কদম গাছে ফুল আছে এখনও কতগুলো। কয়েকদিন আগে সোনার দলার মতো একেকটা ফুল ফুটে গাঢ় সবুজ পাতার ফাঁকে চাঁদের হাট বসিয়েছিল। এখন বেশির ভাগ ফুলের রেনুগুলো ঝরে গেছে। গোটা গোটা সবুজ গোলকগুলো রয়ে গেছে। কিন্তু যা এখন শাসন করছে তার কদম ফুলের সোঁদা গন্ধ। আজ আকাশে চাঁদ নেই। থাকলেও এখান থেকে দেখা যাচ্ছে না। তবে আকাশে কয়েকটা তারা গুচ্ছ গুচ্ছ মেঘের ফাঁকে ফোকরে দেখা যাচ্ছে। একটা তারা এত বড় যে, মনে হচ্ছে সেটা কোনো টাওয়ারের বাতি। সুমনা আকাশের দিকে তাকাল। বিশাল আকাশের দিকে তাকিয়ে তার নিজেকে খানিকটা হালকা বলে বোধ হচ্ছে। চোখের জল শুকিয়ে যাচ্ছে। ঠাণ্ডা বাতাস এসে স্পর্শ বুলিয়ে চোখ দুটোকে আরাম দিচ্ছে।

সে বুক ভরে শ্বাস নিল। বাতাসে কদমফুলের গন্ধ।



নাম তার হৃদয়। খুবই মেধাবী ছেলে ছিল সে। পড়ত সুমনাদের সঙ্গেই। কিন্তু এক সময় বন্ধুবান্ধবদের পাল্লায় পড়ে গেল। তারা তাকে ধরিয়ে দিল মাদক। সব সময় যা হয়, হৃদয় ভাবল, না খেলে ওরা আমাকে ভাববে খ্যাত। তার চেয়ে দিই না একটা টান। আর কোনোদিনও খাব না। নেশা কোনোদিনও আমাকে কব্জা করতে পারবে না। কিন্তু এ এক ভয়াবহ জগত যেখানে ঢোকার রাস্তা অনেক, কিন্তু বেরুনোর রাস্তা খুবই কম। হৃদয় মাদকাসক্ত হয়ে পড়ল।

মাদকাসক্তদের একটা বড় লক্ষণ হলো তারা খুব বিশ্বাসযোগ্যভাবে মিথ্যা কথা বলতে পারে। এই ব্যাপারে হৃদয়ের দক্ষতা একেবারেই অতুলনীয়। এখন, এই মুহূর্তে হৃদয়ের টাকা দরকার। টাকা নেই। নেশা যারা করেন,

তাদের মধ্যে এই লক্ষণও দেখা দেয় খুবই বেশি। কীভাবে টাকা হাতানো যায়, তারা সারাক্ষণ সেই ফিকিরে থাকেন।

হৃদয় প্রথমে গেল তার এক বন্ধু নেওয়াজের কাছে। তার অফিসে। বন্ধুটি হাসিমুখে বলল, 'কী খবর হৃদয়?'

হৃদয় মুখটা পোড়া বেগুনের মতো বানিয়ে বলল, 'নারে দোস্তো। খবর ভালো না। আব্বা মারা গেছে।'

'কী বলিস?'

'বারডেমে বডি রাখা। বাড়ি নিয়া যাবো।'

'ও হো।' নেওয়াজের মুখে সত্যিকারের বিষাদের ছায়া।

'শালা চিকিৎসা করতেই তো সব টাকা শেষ। হাজার দশেক টাকা লাগে। আট হাজার আছে। তুই দোস্তো হাজার দুয়েক দিবি? ধর বাড়ি থেকে এসে তোকে শোধ করে দিব।'

নেওয়াজের মুখ বড় করুণ দেখাচ্ছে। হৃদয় বুঝছে, তার ওষুধে কাজ হয়েছে। এই গাধা অবশ্যই টাকা দেবে। নেওয়াজ বলল, 'আচ্ছা। একটু বস। পকেটে নাই। ধার করে এনে দিচ্ছি।'

নেওয়াজ চেয়ার ছেড়ে উঠল। কামরার বাইরে গেল।

হৃদয় খানিকক্ষণ বসে থাকে। তার অসহ্য লাগছে। শরীরে নেশার টান। আজকে টাকার অভাবে সময়মতো নেশা করা হয় নাই। গা চুলকাতে শুরু করেছে। জিভ শুকিয়ে আসছে। অস্থির অস্থির লাগছে। হারামজাদা নেওয়াজ আসছে না কেন। কুত্তার বাচ্চা মাত্র দুই হাজার টাকা দিতে কয় মিনিট নিবি।

নেওয়াজ ফিরে এল। হারামজাদা টাকা জোগাড় করতে পেরেছে তো? পেরেছে। হাতে ৫০০ টাকার নোট দেখা যাচ্ছে। টাকাগুলো নেওয়াজের হাত থেকে দ্রুত ছিনিয়ে নিয়ে হৃদয় বলল, 'দোস্তো। তুই যে আমার কী উপকার করলি।'

নেওয়াজ বলল, 'না কী আর! তোর বাবার চিকিৎসার খরচ দিতে পারতাম, আল্লাহ্ তাকে যদি বাঁচায়া রাখত, তাইলে না হলে বুঝতাম। ঠিক আছে যা। শক্ত হয়ে থাক।'

হৃদয় বলে, 'ঠিক আছে রে। আমি যাই। অনেক কাজ।'

'আচ্ছা আসিস আবার।'

হৃদয় চেয়ার ছাড়ল। আসিস আবার! আসব। আবার তোর কাছে টাকা

চাইতে আসতে হবে। তখন নতুন কোনো গল্প নিয়ে আসব।

হৃদয় দৌড়ে নামতে থাকে সিঁড়ি দিয়ে। সে আর পারছে না। এখনই নেশা না করলে যেন সে মরেই যাবে। কিন্তু সে পায়ে জোরও পাচ্ছে না। তার সমস্তটা গা কাঁপছে।

'ওই বেবি, ওই বেবির বাচ্চা। খাড়া।' হৃদয় একটা স্কুটার ডাকল। স্কুটারটা দাঁড়ায় কি দাঁড়ায় না, সে দৌড়ে উঠে পড়ল তাতে। 'চল বেটা তালপট্টির গলি। কুইক।'

স্কুটার ছুটতে লাগল। হৃদয়ের কপালে ঘাম। ছুটন্ত ত্রিচক্রযানের দরজা দিয়ে বাতাস এসে তার চোখে-মুখে ঝাপ্টা দিচ্ছে। কিছুটা আরাম লাগবার কথা। হৃদয় সে সবের কিছুই অনুভব করছে না। তার শরীরে খিচুনি মতো উঠছে।

সে একটা গলি ঘুপচির মধ্যে নামল।

এই এলাকায় কে আসে, কেন আসে, সংশ্লিষ্টদের সেটা মুখস্থ। একটা এক-পা লোক ক্রাচে ভর দিয়ে এল হৃদয়ের কাছে। গরমের দিনেও তার গায়ে একটা চাদর।

'আন বেটা। দুইটা।' লাল চোখে গনগনে আগুন ফুটিয়ে বলল হৃদয়। তার পরনের ট্রাউজার কোমর থেকে নেমে হাঁটুর কাছে চলে আসতে চাইছে। ছোট্ট কালো টি শার্টের নিচ থেকে শরীর বেরিয়ে পড়েছে।

লোকটা চলে গেল।

হৃদয় হাঁপাচ্ছে হাঁপরের মতো।

লোকটা দুইটা বোতল নিয়ে ফিরে এল।

হৃদয় বোতলের মুখ খুলবে। একটা বোতল বগলের নিচে রেখে আরেকটা বোতল এক হাতে ধরে আরেক হাতে মুখটা ঘোরাতে আরম্ভ করল। ক্রাচওয়ালা বলল, 'এইখানে খাওন নিষেধ। পুলিশে খুব ডিস্টার্ব করতেছে। যান মিয়া।'

হৃদয় তার হাতে টাকা দিয়ে ভাঙতি বুঝে নিয়ে আবার স্কুটারেই উঠে পড়ল। তার গা কাঁপছে। সে কিছুতেই ঠিক থাকতে পারছে না। স্কুটারওয়ালাকে বলল, 'আরেকটু সামনে গিয়া ওই কমিউনিটি সেন্টারটা পার কইরা রাখো মিয়া।'

স্কুটারওয়ালা সেইখানে রাখলে সে বলল, 'মিয়া তোমার ভাড়া কত হইছে।'

স্কুটারওয়ালা বলল, '৬০ টাকা।'

'ক্যান মিয়া। ডাবল চাইতাছ কেন। মিটার নাই। ধরো...' বলে সে ৫০ টাকার একটা নোট ছুড়ে দিয়ে তাড়াতাড়ি কমিউনিটি সেন্টারের পেছনের দিকে দৌড় ধরল।

হৃদয় তো তার মনুষ্যবুদ্ধি দিয়ে এখন চালিত হচ্ছে না। তাকে চালনা করছে তার ভেতরে বসে থাকা একটা পশু। যেটা আগে তার শরীরে ছিল না। কয়েকদিনের অভ্যাসে সেটা এখন তার শরীরের মধ্যে বাসা বেঁধেছে। সেই পশুটাই এখন তাকে পরিচালনা করছে। তার গতিবিধি নিয়ন্ত্রণ করছে। কালো রোমশ বিবেক-বুদ্ধিহীন সেই পশুটার নাম নেশা।

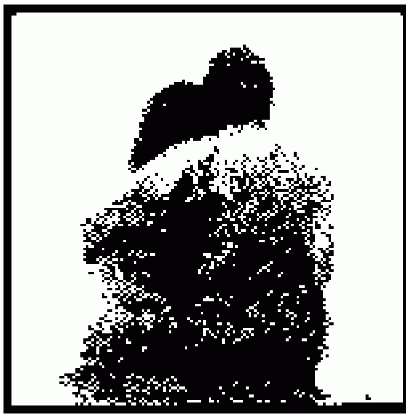
কমিউনিটি সেন্টার থেকে বেরিয়ে হৃদয় হাঁটতে লাগল। হাঁটতে হাঁটতে সে ঢুকে পড়ল ওই এলাকার শিশু পার্কটাতে। পরিত্যক্ত ধরনের পার্ক। কয়েকজন ছিন্নমূল নারীপুরুষ শিশু ওইখানে শুয়ে বসে আছে। কয়েকটা ছাগল আর গরু চরছে।

দুটো ঘেয়ো কুকুর নিজেদের মধ্যে মারামারি করছে। হৃদয় সেইখানে একটা বেঞ্চ দখল করল। তারপর বেঞ্চে শুয়ে ভাদ্রের আকাশ দেখতে লাগল।

আকাশটা আজ গুমোট হয়ে আছে।

তার সমস্তটা শরীর ঘামে জবজব করছে। সেদিকে তার খেয়াল নেই।

একটা মেঠো ইঁদুর তার পায়ের কাছে কার ফেলে যাওয়া বাদামের দানা ঠোকরাচ্ছে, সে তাও টের পাচ্ছে না।



সুমনা বাসার কম্পিউটারে বসে আগামীকালের লেকচার শিট তৈরি করছিল। নতুন শিক্ষক সে। পড়াতে যাবার আগে তৈরি হয়ে যায়। ইন্টারনেটে আজকাল বহু কিছু পাওয়া যায়। জগৎটা কত সহজ হয়ে যাচ্ছে। লাইব্রেরির কাজও ইন্টারনেটে বসেই সারা যায়।

'মন, মন। তোর তাহের আংকেল।' আবদুস সাত্তার সাহেব একটা কর্ডলেস ফোন হাতে এগিয়ে আসেন। 'মন তোর ফোন।'

'কে বাবা?'

'আরে ওয়ার্ল্ড ইউনিভার্সিটির ভিসি। তোকে ওদের ইউনিভার্সিটিতে নিতে চায়। নে কথা বল।'

সুমনা কম্পিউটারের পর্দা থেকে মুখ না তুলে বলল, 'বাবা, আমি পাবলিক ইউনিভার্সিটিতে পড়াচ্ছি। ভালো আছি। আমি প্রাইভেট ইউনিভার্সিটিতে যাব না।'

'কথা বল।' সাত্তার সাহেব ফোনটা এগিয়ে ধরলেন।

সুমনা ফোন কানে তুলে নিয়ে বলল, 'জি আংকেল স্লামালেকুম। জি আপনার শরীরটা ভালো আংকেল?'

ওপাশ থেকে ওয়ার্ল্ড ইউনিভার্সিটির ভিসি সাহেব বললেন, 'হ্যাঁ ভালো। শোনো মা সুমনা। তোমার বাবাকে বলছিলাম। তুমি সরকারি ইউনির্ভাসিটিতে জয়েন করলা কেন। এত ভালো রেজাল্ট করে কেউ ওখানে থাকে! আমাদেরটাতে চলে আসো। আমাদের এনভায়রেনমেন্ট ভালো। স্যালারি তো আকাশপাতাল।'

'আংকেল। আপনাদেরটাতে তো শুধু বড়লোকের ছেলেমেয়েরা পড়ে। এইটাতে তো গরিব ধনী সবাই পড়ে। আপনিও পড়েছেন। আমি পড়েছি। বাবা পড়েছেন। আমি এইটাতেই থাকতে চাই।'

ভিসি সাহেব বললেন, 'মারে। তোমার গুড উইলটাকে আমি সাপোর্ট করি। স্যালুটও করি। কিন্তু খুব পলিটিক্স ওখানে। আমিও তো ছিলাম। আমি জানি। তোমাকে তো ওরা ভালো কিছু করতে দিবে না। একটা সময় এইসব দেখে তোমার মন খারাপ হয়ে যাবে।'

'যখন হবে তখন না হয় আমি আপনাদের কাছে যাব?'

'তখন কি আর তোমার জন্যে ভালো জায়গা রাখতে পারব?'

'ভালো জায়গা শুরুতে দিতে হবে না। কোন রকমে একটা জায়গা দিয়েন।'

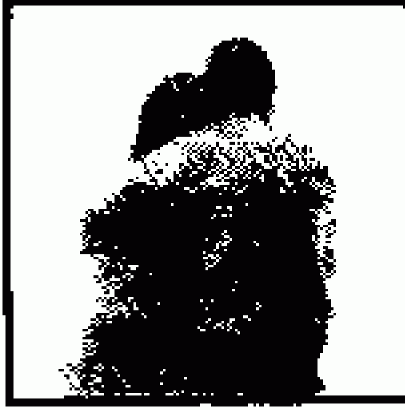
'দাও তোমার বাবাকে দাও।'

'আংকেল! কিছু মনে করলেন না তো।'

'আরে না। কী যে বলে!'

'বাবাকে দিচ্ছি আংকেল। খোদা হাফেজ।'

মন ফোনটা হাতে নিয়ে বাবার সন্ধানে হাঁটে, 'বাবা, বাবা, কই গেলা। আংকেলের সঙ্গে কথা বলো। বাবা...'



ঢাকা শহরে কতগুলো মার্কেট ভবন হয়েছে, যেগুলোকে আধুনিক শপিং সেন্টার বলা হলেও ভেতরটা ভয়াবহ গলির মতো। দেয়ালে পলেস্তারা পড়েনি। দোকানের পর দোকান খালি পড়ে আছে। সেই রকম একটা মার্কেটের আড়াইতলার সিঁড়িতে বসে আছে হৃদয়। পরনে কতদিনের না ধোয়া জিনসের প্যান্ট। সেটা খুলে পড়বে যে কোনো সময়। গায়ে একটা কালো টিশার্ট। তাতে পিকাসোর আঁকা একটা সাইকেলে ছবি।

হৃদয় তার দুইচারটা মাদকাসক্ত বন্ধুদের নিয়ে বসে আড্ডা দিচ্ছে। তারা সবাই মিলে গান করছে—

তোমার ঘরে বাস করে কারা ও মন জানো না।
একজনে ছবি আঁকে একমনে ওহা ও মন
আরেকজন বসে বসে রং মাখে
আবার সেই ছবিটা নষ্ট করে কোনজনা কোনজনা
তোমার ঘরে বাস করে কারা...

সুমনা এই সিঁড়ি দিয়েই ওপরে উঠছিল। ওপরে একটা হস্তশিল্পের দোকান আছে। সেইখানে ইকেবানা কিনতে পাওয়া যায়। জাপানি কায়দায় তারা খুব সুন্দর করে ফুল সাজিয়ে বিক্রি করে।

সুমনাকে দেখে হৃদয়দের গান থেমে গেল।

হৃদয় দেখল, আরে এ তো সুমনা। সে তাড়াতাড়ি দাঁড়ায়। 'আরে সুমনা...'

সুমনাও চমকে উঠল, হাসিমুখে বলল, 'হৃদয় না?'

'হ্যাঁ।'

'কী অবস্থা তোমার? '

'এই তো!'

'এইখানে কী করো?'

'আর কী করব! বন্ধুবান্ধবদের সাথে আড্ডা দেই। তোমার খবর কী?'

'আছি। চলছে।'

'কই আছো?'

'ইউনিভার্সিটিতে জয়েন করেছি তো!'

'ও তুমি তো আবার মাস্টারনি হইছ। ভালো করছ।'

'তুমি?'

'আমি? আমি একটা চাকরি করি আর কী। ছোটখাট।'

'এই আমি যাইরে। একটু তাড়া আছে। শোনো। তুমি যোগাযোগ রাইখো।'

'ঠিক আছে। রাখব।'

সুমনা চলে গেল তিনতলার দিকে। হৃদয়ের ভাবভঙ্গি পোশাকআশাক তার ভালো লাগে না। আরে কী মেরিটেরিয়স স্টুডেন্টই না ছিল হৃদয়টা। এই রকম হয়েছে কেন সে। কী জানি! বেশি বুদ্ধিমানরা আবার জগতের সঙ্গে খাপ খাওয়াতে পারে না। হৃদয়ের কি সেই সমস্যা হচ্ছে নাকি? সক্রেটিসের মতো সে কি এখন 'নো দাইসেল্ফ' করছে নাকি 'কা তব কান্তা', 'আমি কার, কে আমার' ভাব ধরেছে?

সুমনা ওপরে চলে গেলে হৃদয়ের বন্ধুরা তাকে ধরে বসল, 'দোস্তো মালটা কেডা।'

'আরে আমার ক্লাসমেট আছিল'—হৃদয় ঠোঁট উল্টে বলল।

'আছিল? আছিল মানে কী? ওয়ান্স ক্লাসমেট ইজ এ ক্লাসমেট ফরএভার। যে একবার ক্লাসমেট সে চিরকাল ক্লাসমেট। সে তো চিরদিনের বন্ধু।' একজন বিজ্ঞ পণ্ডিত সিগারেটের ধোঁয়া ছেড়ে বললেন।

'তা ঠিক।'

'তাইলে দোস্তো কও তোমার এই রকম একটা ফ্রেন্ড থাকতে আমগো টাকার অভাব হয়। এইটা কি দোস্তো কোনো কামের কথা হইল?'

'না হইল না।' আরেকজন কাশি থামিয়ে বলল। 'কী কস হৃদয়?'

হৃদয় দুই হাতের দশ আঙুলে কাঁচির মতো বানিয়ে বলল, 'তাই তো

দেখতাছি।'

'তাইলে দোস্তো তুমি তোমার ফ্রেন্ডশিপটা একটু রিনিউ করো। বুঝছ?'

'হ। সেইটা তো বুঝলাম'—বন্ধুর পরামর্শে হৃদয় সম্মতি জানাল।

'এই মাইয়ারে যদি আমরা লাইনে আনতে পারি, তাইলে ধরো আমগো লাইনে সাপ্লাইয়ের কোনো চিন্তাই থাকব না।'

'হ তা থাকব না।'

'তাইলে?'

'তাইলে কী?'

'তাইলে তুমি লাইগা পড়ো দোস্তো?'

'তাইলে তুমি লাইগা পড়ো দোস্তো, কইলেই হয় মিয়া। এত সস্তা? প্রত্যেকটা জিনিসের একটা সিজন আছে। সিজনের আগে ফল নাই। সবুর না করলে মেওয়া ফলে। বুঝছ?'

'সেইটা বুঝলাম। কিন্তু রাইতের বেলা যখন বেড়া উঠব, পকেটে ট্যাকা থাকব না, তখন সেইটা বুইঝা বইসা থাকা যাইব? মাল ছাড়া এই দুনিয়ায় মাল খাওয়া যায়? শেষে না হাইজাক করতে গিয়া ধরা পইড়া গণধোলাই খাইয়া সোজা হইয়া যাই।'

'হ। ভবযন্ত্রণা শেষ হয় অন্তত।'

ওরা আবার গান ধরে—

তোমার ঘরে বাস করে কারা
ও মন জানো না...



সুমনার মোবাইল ফোনে রিং বেজে উঠল। সুমনা মোবাইল ফোনটা খুঁজে পাচ্ছে না। কারণ সেটটা তার ব্যাগে। ব্যাগ থেকে বের করে কল রিসিভ করতে না করতেই কল কেটে গেল। মিসড কলের তালিকায় দেখা গেল, লেখা

প্রাইভেট নাম্বার। তার মানে বিদেশি কল। সুমনার হৃদয়ে খানিকটা চাঞ্চল্য দেখা দিল। বিদেশি কল তার একটাই আসে। তবে গত কয়েকদিন ধরে আসছে না। সুমনা এই ফোনটার জন্যেই কেবল অপেক্ষা করে। যেই টেলিফোন আসার কথা, সচরাচর আসে না, প্রতীক্ষাতে প্রতীক্ষাতে, সূর্য ডোবে রক্তপাতে, একান্তে যার হাসার কথা, হাসে না।

আবার ফোনের রিংগার বেজে উঠল।

সুমনা ফোনটার সবুজ বাটনে চাপ দিল দ্রুত।

'হ্যালো। এই কী খবর? আপনি আমাকে ফোন করেন না কেন?' সুমনা একটু গলা উঁচিয়ে কণ্ঠে আহ্লাদ ফুটিয়ে বলল।

'আর বোলো না। এত এসাইনমেন্ট দিয়েছে না! আরে সারাদিন রাত আমাকে লাইব্রেরিতে কাটাতে হচ্ছে। সারাক্ষণ খালি স্টাডি আর স্টাডি।'

'শুভ্র ভাই, তাইলে আর ফোন করলেন কেন। যান লাইব্রেরিতে গিয়া স্টাডি করেন।'

'মাইন্ড করেছ মনে হচ্ছে।'

'না! মাইন্ড করব না! একটা মেইল করলেও তো বুঝতাম।'

'মেইল খোলারও সময় পাই না।'

'বাপরে!'

'শোনো। বেশি চিন্তা কোরো না। নেক্সট সামারে দেশে এসে যাচ্ছি। সুপারভাইজারকে বলেছি। বলেছে যাও অসুবিধা নাই।'

'সামার আসতে অনেক দেরি। ততদিনে আমি বুড়ি হয়ে যাব।'

'অসুবিধা নাই। আমি অলরেডি বুড়া। বুড়াবুড়ি ভালোই জমবে। আংকেল ভালো আছেন?'

'আছেন আর কী!'

এই সময় আবদুস সাত্তার সাহেব ওই রুমে উঁকি দিলেন। সুমনা টেলিফোনটা কান থেকে সরিয়ে বলল, 'বাবা ভালো আছো?'

'এ আবার কী কথা। তোর সাথে সারাদিনই তো দেখা হচ্ছে। এখন এই কোশ্চেনের মানে কী?' আবদুস সাত্তার সাহেব হাসি মুখে বললেন।

'আরে শুভ্র ভাই ফোন করেছেন। ডালাস থেকে'—সুমনা ফোন কান থেকে না সরিয়ে বলল।

'তো? তাতে কী আমার ভালো থাকা খারাপ থাকার কোনো ঘটনা ঘটল?'

'উনি জিজ্ঞাসা করলেন।'

'কী?'

'তুমি ভালো আছ না কি?'

'নিশ্চয়ই ভালো আছি। আরে ভালো থাকার হুকুম আছে না। হা হা হা।'

আবদুস সাত্তার সাহেব রুম থেকে বেরিয়ে গেলেন। মেয়ে বড় হয়েছে। তার কিছু ব্যক্তিগত ব্যাপার থাকবে। কথাবার্তা থাকবে। সেসবের মধ্যে নাক গলানো তার মোটেও উচিত হবে না।

সুমনা আবার ফোনালাপে মন বসাল— 'হ্যালো, বাবা যা কথা পেঁচাতে পারে। একটা ভালো আছি বার করতে কত কথা বলতে হলো। শোনেন। আপনাকে আর বিল তুলতে হবে না। আপনি এখন রাখেন।'

'না আরেকটু কথা বলি'—শুভ্র বলল।

'দরকার নাই। আপনি মেইল করেন। আপনার ডলার বাঁচবে।'

'এই আমি কি কিপ্টা নাকি?'

'না না কিপ্টা হবেন কেন?'

'এই আমার কার্ড শেষ হয়ে আসছে। রাখি। বাই।'

'বাই।'

ফোন রেখে সুমনা হেসে উঠল। কিপ্টা না। কার্ড শেষ হয়ে আসছে, অমনি ফোন রাখার জন্যে অস্থির। আরে একবার কার্ড ছাড়াই ফোন কর। না, তা করবে কেন। তাতে যে বিল বেশি উঠবে। হি হি।

বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিপার্টমেন্টে নিজের ছোট্ট বসবার ঘরটিতে বসে মন শুভ্রর কিপ্টেমির কথা ভাবছিল আর একা একা হাসছিল। শুভ্র গতবার যখন ঢাকায় এসেছিলেন, তখন সুমনা তার সঙ্গে স্কুটারে উঠেছিল। তারপর স্কুটারের ভাড়া দেওয়ার পালা।

সুমনা বলল, 'ভাড়া আমি দেই।'

শুভ্র বলল, 'নানা আমি দেই।'

'আরে রাখেন আমি দিচ্ছি।'

শুভ্র হঠাৎ করে বলে বসল, 'আচ্ছা আসো দুজনে শেয়ার করি। কত হয়েছে ভাড়া। ২৫। তাহলে তো মুশকিল। সাড়ে ১২ টাকা করে আসবে...'

কী রকম কিপ্টা। সুমনা এবার ছাত্রদের রিপোর্ট নিয়ে বসল। এসাইনমেন্ট দিয়েছিল ছাত্রদের। এখন বসে বসে দেখতে হবে। বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের পড়ানো ছাড়াও আরো নানা কিছু করতে হয়!

ম্যাডাম আসব?

সুমনা মন দিয়ে খাতা দেখছিল। চোখ না তুলেই সে বলল, 'কোন ইয়ার?'

জবাব এলো, 'লাস্ট ইয়ার!'

সুমনা ভ্রু কুচকে মুখ তুলে চাইল। দরজায় দাঁড়িয়ে হৃদয়। উসকোখুশকো চুল। দুদিনের শেভ না করা দাড়ি। টিশার্ট। জিনস।

'হৃদয়? তুমি?'

হৃদয় ভারি গলায় বলল, 'চলে আসলাম।'

সুমনা বলল, 'আসো, ভিতরে এসে বসো। হঠাৎ?'

হৃদয় ভেতরে এলো স্যান্ডেলে শব্দ তুলে। একটা চেয়ার টেনে নিয়ে বসতে বসতে বলল, 'হঠাৎ কী? দেখা হইল না সেইদিন।'

'তা হলো। কেন এসেছ? কোনো দরকার?'

'হুঁ।'

'দরকারটা কী?'

'সরাসরি বলি?'

'বলো।'

'তোমাকে সেদিন খুব সুন্দর লাগতেছিল। দেখে চোখ সরাতে পারতেছিলাম না। ন্যাচারালি তবু সরাতে হইছে। দেখে আসলে মন ভরে নাই। তাই আজকে আবার দেখতে আসলাম।'

সুমনা একটুও অপ্রস্তুত না হয়ে বলল, 'দেখো। দুই মিনিট। দুই মিনিট দেখে মন ভরলে চলে যাও।'

'দুই মিনিট? তোমার ঘড়িটা দাও। আমি হাতে নিয়ে দুই মিনিট ধরে দেখি।'

'আমার ঘড়ির দিকে তুমি তাকিয়ে থাকলে তো আমাকে দেখতে পারবে না। আমিই ঘড়ি দেখছি। তুমি আমাকে দেখো। অলরেডি ৩৫ সেকেন্ড চলে গেছে।'

'তুমি এত কিপ্টা কেন? মাত্র দুই মিনিট।'

'আমি তো এইখানে একজন টিচার। আমার এখনকার সময় স্টুডেন্টদের জন্যে বা ধরো ডিপার্টমেন্টের জন্যে। ঠিক গেস্ট এন্টারটেইন করার জন্যে না। তাই না?'

'কিছু বললা?'

'বললাম। শোনো নাই?'

'না আমি তোমার কোনো কথা এখন শুনতেছি না। আমি এখন তোমাকে দেখতেছি। আমার দুই চোখ দিয়া। আমার দুই কান দিয়াও। আমার সমস্ত সত্তা দিয়া। আমার ভালো লাগতেছে। আমার আরো দেখতে ইচ্ছা করতেছে। আমার সাধ মিটতেছে না। আমার আশ মিটতেছে না।'

সুমনা কণ্ঠে যথেষ্ট পরিমাণে গাম্ভীর্য এনে বলল, 'হৃদয় তুমি যাও।'

'আচ্ছা যাচ্ছি। শোনো সব দোষ কিন্তু তোমার। তুমি আমাকে দেখা দিয়া পাগল বানাইছ। এখন আমার কোনো উপায় ছিল না। তাই আমি আসছি। কাজেই এখন রাহা খরচটা দাও।'

'মানে কী?'

'কনভেয়েন্স খরচটা দিবা না।'

'কত?'

'দাও। অন্তত ইয়েলো ক্যাবের ফেয়ারটা দিলেই ফেয়ার হবে।'

'কত?'

'৫০০!'

'উফ। আমি তো গরিব মাস্টারনি। এত টাকা কই পাব। নাও ধরো।' সুমনা ব্যাগ থেকে হাতড়ে টাকা বের করে হৃদয়ের দিকে বাড়িয়ে দিল।

'থ্যাংকস'—হৃদয় চেয়ার ছেড়ে উঠে পড়ল। টাকাটা পকেটে পুরল। তারপর স্যান্ডেল মেঝেতে ঘষতে ঘষতে বেরিয়ে গেল। বারান্দা পেরিয়ে সে পথে নামল। খুব গরম পড়েছে। আকাশটা ঘোলাটে। এতক্ষণ ফ্যানের বাতাসটা তাকে আরাম দিচ্ছিল।

যাক। আজকের মতো ৫০০টাকাই যথেষ্ট। এই খেজুরগাছে হাঁড়ি লাগালেই রস বেরুবে। এই গাছ একদিনে কেটে ফেলার মানে হয় না।

হৃদয় তার কুসঙ্গে ফিরে যায়। তারা মাদক গ্রহণ করে মাটিতে গড়াগড়ি খায়। ঝিমোয়। ওঠে। বসে। দেয়ালে পিঠ দিয়ে মেঝেতে পা ছড়িয়ে দেয়। তারা কাঁদে। হাসে। গান করে—

সব আগুন যায় নেভানো
হায় আগুন লাগলে মনে
সে আগুন নেবে না নেবে না...
মনের ব্যথা বোঝে না যে

মনের দাম খোঁজে না যে
তারে মন দেবে না দেবে না।

'দোস্তো' একজন হৃদয়ের হাত ধরে টানতে টানতে বলল, 'সুমনা ম্যাডামরে পটায়া পটায়া এই লাইনে লইয়া আয়। বড়লোকের মেয়ে। একবার যদি জিনিস ধরায়া দিতে পারস, তাইলে আমগো আর টাকার চিন্তা থাকব না।'

হৃদয় বলল, 'কথাটা খারাপ বলিস নাই দোস্তো। উহ্‌। শালা টাকার ধান্দায় ধান্দায় তো জীবন গেল গিয়া।'

আরেকজন উঠে দাঁড়িয়ে সামনে অদৃশ্য মাইক্রোফোন ধরে বলল, 'হ্যালো মাইক্রোফোন টেস্টিং, হ্যালো, ওয়ান টু থ্রি ফোর... হ্যালো মাইক্রোফোন...'

আরেকজন বলল, 'এই হারামজাদা। চোখের মাথা খাইছস। দেখোস না কারেন্ট নাই। মাইক ছাড়া ক।'

'না মাইক ছাড়া বলব না। ব্যাটারিতে লাইন দে। হ্যালো। ফুঃ। ফুঃ।'

'আইছে হালায়। নে তোর মাইকের আওয়াজ ঠিক আছে। ক কী কইবি।'

'এই শালা। আমি কথা কমু নাকি। আমি তো ভাষণ দিমু। বন্ধুগণ! আমাকে ভোট দিন। আমাকে ভোট দিলে আমি আপনাদের জন্যে ডাইলের বন্যা বয়ায়া দিব।'

'আরে বেটা গত টার্মেও তো তুই ইলেকশনের আগে এই কমিটমেন্ট করছিলি। হালায় সারা বছর খবর নাই, অহন ভোটের আগে আইছে। মার হালারে। মার।'

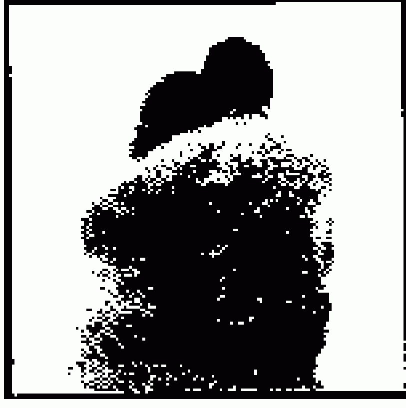
'না মেরো না। ওকে মেরো না। নো সন্ত্রাস। নো ভায়োলেন্স। কুল। আমার ফিলিংস আসতাছে। সব চোপ।'

'এই শালা চোপ। হৃদয়রে দিয়া সুমনা ম্যাডামকে ধরতে হইব। হৃদয় + সুমনা...'

বাকি সবাই হৃদয় প্লাস সুমনা হৃদয় প্লাস সুমনা করতে লাগল।

হৃদয় বলল, 'হাঃ। হৃদয় যোগ মন... হাঃ... হোঃ '

তারপর সে গান ধরল, কেন আনো ফুলডোর, আজি বিদায়বেলা... মোছো মোছো আঁখিজল, আজি বিদায়বেলা...



হৃদয়ের মাথায় এখন একটাই চিন্তা। কী করে সুমনাকে পটানো যায়। সুমনা বড়লোকের মেয়ে। নিজের একটা চাকরি-বাকরি আছে। মাস শেষে বেতন পায়। ওকে এই লাইনে আনতে হবে। একবার লাইনে তুলতে পারলে আর চিন্তা নাই। ইঞ্জিন ছাড়াই গাড়ি চলতে থাকবে। তখন হৃদয়কে আর মাল খাওয়ার টাকা জোগাড় করার জন্যে ভাবতে হবে না। সুমনাই টাকা জোগাড় করবে। সুমনা মেয়েটা সুন্দরী আছে যাহোক। ও প্রথম কয়েক মাস বাসা থেকে টাকা আনতে পারবে। তারপর এখান ওখান থেকে টাকা জোগাড় করা ওর জন্যে কোনো ব্যাপারই হবে না। কারণ, সৌন্দর্য হচ্ছে শক্তি। বিউটি ইজ পাওয়ার।

হা হা হা।

যুগ পাল্টে যাচ্ছে। যে যুগের যে ভাও। আগে একটা সময় ছিল, যখন বলা হতো, নলেজ ইজ পাওয়ার। জ্ঞানই শক্তি। সেইদিন আর নাই। জ্ঞান দিয়া আর কিছু হয় না। এখনকার শ্লোগান পাল্টে গেছে। এখন সৌন্দর্য হচ্ছে শক্তি। আসুন ভাই ও বোনগণ, সবাই আমরা ফেয়ারনেস ক্রিম মাখি। আসুন আমাদের সবগুলো লাইব্রেরি থেকে সব বই নামিয়ে পুড়িয়ে ফেলি। তার বদলে সেইসব বইয়ের র‍্যাকে রেখে দিই কম্প্লেক্সন ক্রিম। বিউটি ক্রিম। যা আপনার ত্বকের রং ফর্সা করবে। দিন দিন আপনি হয়ে উঠবেন আরো ফর্সা আরও উজ্জ্বল আরও আকর্ষণীয়। মাত্র ২১ দিনে আপনি হয়ে উঠবেন সবচেয়ে সুন্দরী। আর তখন আপনি হবেন সবচেয়ে শক্তিশালিনী। আপনার ওই সৌন্দর্য ভাঙিয়ে আপনি রাষ্ট্রক্ষমতায় অদলবদল ঘটাবেন। আপনি যুদ্ধাস্ত্র কিনবেন। আপনি আমাকে ডাইলের টাকা জোগাড় করে দেবেন। সৌন্দর্য হচ্ছে শক্তি।

আর সুমনা। মন আমার। তুমি সুন্দর। কাজেই তুমিই হলে শক্তি। তোমার মতো একটা পারমাণবিক শক্তি অরক্ষিত থাকতে পারে না। যে কোনো সময় বুশ তোমার ওপরে প্রিএম্পটিভ হামলা চালাতে পারে। তুমি হলো ডব্লিউএমডি। উইম্যান অফ ম্যাস ডেস্ট্রাকশন। বুশ তোমাকে একা একা

চলতে দেবে না। তোমার একজন সঙ্গী দরকার। মন, আমি হব তোমার সঙ্গী। তুমি আমাকে ডাইলের টাকা সাপ্লাই দেবে। তার বিনিময়ে আমি তোমাকে এনে দেব এশিয়ার সবচেয়ে উৎকৃষ্ট ডাইল।

ভাবতে ভাবতে হৃদয় সুমনাদের বাসার সামনে চলে এলো। রাস্তার ধারে দাঁড়িয়ে পকেট থেকে মোবাইল ফোন বের করে কল করল সুমনাকে। মনের নাম্বারটা সে যোগাড় করে ফেলেছে। এটা তার কাছে কোনো ব্যাপারই না। বেশ রাত হয়েছে। মাথার ওপরে সোডিয়াম বাতি জ্বলছে।

হৃদয় একটা রোড ডিভাইডারে বসে পড়ল।

দূরে একটা চাঁদ দেখা যাচ্ছে ধাবমান মেঘের ফাঁকে।

রিং হচ্ছে।

হৃদয় গান ধরে—

আকাশেতে লক্ষ তারা চাঁদ কিন্তু একটা রে...

সুমনা বাসায়ই ছিল। তার মোবাইল ফোনে রিং বেজে উঠল। সুমনা ফোন রিসিভ করল।

'হ্যালো'...

'হ্যালো সুমনা, আমি হৃদয়'...

'হ্যাঁ। কী খবর? তুমি আমার মোবাইল নাম্বার কই পেলে?'

'আরে চাওয়ার মতো করে চাইলে কী পাওয়া যায় না বলো। মন। তোমাকে আবার দেখতে ইচ্ছা করতেছে।'

'তো কী করা যাবে?'

'তুমি একটু তোমাদের বারান্দায় আসবা। আমি তোমাদের বাসার সামনে দাঁড়ায়া আছি। তোমাকে এক নজর দেখেই চলে যাবো।'

'না এত রাতে! আমি ঘরে পরার ড্রেস পরে আছি। আসতে পারব না।'

'প্লিজ মন। একটু দেখেই চলে যাব।'

'হৃদয়। আমি একটা টিচার মানুষ। আমি তো টিন এজ কেউ না। তুমি আমার সাথে এই রকম করছ কেন?'

'জানি না কেন। প্লিজ...আসো আসো।'

'আরে না।'

'আরে আসো তো প্লিজ...'

'আচ্ছা এক মিনিট ধরো।'

সুমনা তাড়াতাড়ি কাপড় পাল্টে নিল। সে পরে ছিল বাসায় পরবার লং ড্রেস। এইটা পরে কেউ বারান্দায় যায় না।

সুমনা বারান্দায় এল। হাতে মোবাইল ফোন। ফোন কানে দিয়ে বুঝল লাইন কেটে গেছে। সামনে তাকিয়ে দেখল নিচে সত্যি হৃদয়। রিসিভড নম্বর দেখে সে হৃদয়কে ফোন দিল।

হৃদয় ফোন ধরল, 'হ্যালো।'

সুমনা বলল, 'এই পাগলা! এইখানে কী পাগলামো করছ?'

হৃদয় ওপরের দিকে তাকাল, 'আরেব্বাস। তোমাকে দেবির মতো লাগতেছে। মনে হচ্ছে, স্বর্গের বারান্দায় এই মাত্র দেবি এসে দাঁড়ালেন।'

'থাক। আর যন্ত্রণা কোরো না। এখন যাও।'

'না যাবো না।'

'কী বলো? যাও।'

'তোমাকে দেখে দেখে তো মন ভরতেছে না।'

'প্লিজ...যাও।'

'না যাব না।'

'তাহলে থাকো তুমি আমি গেলাম...'

'যাও। তবু আমি এখানে দাঁড়ায়াই থাকব।'

'থাকো।'

সুমনা ভেতরে চলে গেল। ঘরের ভিতরে গিয়ে বসে রইল। তার অস্থির অস্থির লাগে। সে পর্দা সরিয়ে দেখার চেষ্টা করল পাগলাটা গেছে কিনা।

আবার ফোন এলো।

সুমনা ফোন ধরে বলল, 'এই তুমি যাও নাই?'

হৃদয় বলল, 'যাই নাই। তুমি ঘুমাও। আমি এইখানে দাঁড়ায়াই থাকব।'

'এইটা কোনো কথা! আমি মোবাইল অফ করে দিব।'

'দাও।'

'প্লিজ যাও। প্লিজ। কালকে দিনের বেলা বাসায় আসো। বাসায় বসে গল্প কোরো।'

'ঠিক আছে। শোনো কিছু টাকা ফ্লেক্সিলোড করে পাঠাও না।'

'আমি পারি না। প্লিজ...'

'আমি শিখায়া দিচ্ছি...'

বাবা এসে দরজায় দাঁড়ালেন—'এই এত রাতে বার বার ফোন আসছে?

কারো কোনো বিপদ আপদ হয় নাই তো?'

সুমনা বলল, 'না বাবা। কারো কোনো বিপদ-আপদ না। আমি একটা পাগলের পাল্লায় পড়েছি।'

'যাও তুমি ঘুমাও।'

'তুই ঘুমা।'

সুমনা বলল, 'আচ্ছা ঘুমাচ্ছি। এই যে ফোন একেবারে পাওয়ার অফ করে দিচ্ছি। বাই হৃদয়।'

ফোনের লাল বোতাম টিপে ধরে রেখে সত্যিই পাওয়ার অফ করে দিল সুমনা। উঠে বাবার কাছে গিয়ে বলল, 'স্যরি বাবা, যাও বাবা ঘুমাও। স্যরি। তোমার ঘুম ভাঙালাম।'

বাবা বললন, 'আরে এই জীবনটা তো ঘুমিয়েই কাটিয়ে দিলাম। তুই ঘুমা...'



পরের দিন আবার সুমনার ইউনিভার্সিটির চেম্বারে গিয়ে হাজির হলো হৃদয়।

দরজার কবাট খুলে মাথাটা বাড়িয়ে বলল, 'মন কেমন আছ?'

সুমনা হৃদয়কে দেখেই শক্ত হয়ে গেল—'এই, তুমি এখানে এসেছ কেন?'

'দেখতে এসেছি।'

'অত দেখা লাগবে না। যাও।'

'আমি তোমাকে সারাক্ষণ দেখতে চাই। এখানে ওখানে সেখানে...'

সুমনা হেসে বলল, 'এই সব নাটুকে ডায়লগ বোলো না তো হাসি পায়।'

হৃদয় ঘরের ভেতরে ঢুকতে ঢুকতে বলল, 'শোনো। আজকে বিকালটা তুমি আমার জন্যে বরাদ্দ রাখো। আমরা এক সাথে ঘুরব।'

'কোথায়?' সুমনা কপালে ভাঁজ ফেলে ভুরু কুচকে বলল।

'তোমার যেখানে ইচ্ছা।'

'আমার কোথায় যেতে ইচ্ছা করছে না।'

'কেন করবে না?'

'আচ্ছা তুমি এখন যাও তো। এইখানে সিন ক্রিয়েট কোরো না।'

'তাহলে বলো বিকালে তুমি আসছ?'

'কোথায়?'

'আজিজ সুপার মার্কেটে আসো।'

'যাও তো যাও তো এখন। এখনই হেড স্যার ডেকে পাঠাবেন। যাও।'

'আচ্ছা যাচ্ছি। আপাতত ৫০০টা টাকা দাও।' চেয়ারের পেছনে দু হাত রেখে হৃদয় বলল।

'আবার ৫০০ টাকা?'

সুমনার অভিব্যক্তিতে স্পষ্টতই বিরক্তির চিহ্ন। কিন্তু ব্যাগ থেকে বের করে সে একটা ৫০০ টাকার নোট ঠিকই তুলে দিল হৃদয়ের হাতে। বলল, 'এবার প্লিজ যাও।'

'থ্যাংকস, বিকালে দেখা হবে'—বলে হৃদয় দরজার দিকে পা বাড়াল।

যাওয়ার সময় মেঝেতে স্যান্ডেল ছেচড়ানোর বিশ্রি শব্দ হতে লাগল যথারীতি ।

সেই শব্দ মিলিয়ে যাওয়ার পরে সুমনা নিজের কাজে মন বসাল।

সুমনা ভেবেছিল হৃদয়ের সঙ্গে দেখা করতে আজিজ সুপার মার্কেটে যাবে না। কিন্তু হৃদয় এতবার করে ফোন করে তাকে ডাকতে লাগল, সে না করতে পারল না। ভাবল, যাওয়াই যাক। পারলে কিছু বইপত্র কেনা যাবে। শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের শ্রেষ্ঠ কবিতার বইটা সে তার ঘরে খুঁজে পাচ্ছে না। সে হৃদয়কে ফোনে বলল, 'দেখো তো শক্তি চট্টোপ্যাধ্যায়ের কবিতার বই আছে কিনা।'

'আরে আছে মানে। আসো। তোমার জন্যে আমি খুঁজে আলাদা করে রাখছি।'

আজিজ সুপার মার্কেটে নেমে সুমনা সরাসরি ঢুকে গেল একটা বইয়ের দোকানে। শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের শ্রেষ্ঠ কবিতা আছে?

না। ছিল। বিক্রি হয়ে গেছে। দোকানি বললেন। এমন একটা ভাব, যেন সকালে ভাজা সিংগারা, সব বিক্রি হয়ে ফুরিয়ে গেছে।

কোত্থেকে হৃদয় উদিত হলো কে জানে।

'আইলা?' হৃদয় বলল।

'এই, আমার শক্তি কই?'

'সৌন্দর্য হচ্ছে শক্তি'—হৃদয় বলল।

'মানে?'

'মানে তুমি জানো না? টিভিতে শোনো নাই। সৌন্দর্য হচ্ছে শক্তি। বিউটি ইজ পাওয়ার।'

'আরে ওই পাওয়ার এনার্জি এইসব কোনোকিছুর কথাই আমি বলি নাই। আমি বলছি শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের শ্রেষ্ঠ কবিতার বইটা কোনো দোকানে পাইলা?'

'ও শক্তি। শক্তিরটা কিন্তু কবিতা না। তারটা হলো পদ্য। সত্যজিতের ছবি, শক্তির পদ্য, লিটল ম্যাগাজিনের লেখা অনবদ্য। সত্যজিৎ যেমন লিখেছিলেন, বই নয়, ছবি। আগে লোকে ফিল্মকে বই বলত। সত্যজিতের খুব আপত্তি ছিল। তেমনি শক্তি তার কবিতাকে কবিতা বলেন না। বলেন পদ্য।'

'আচ্ছা। ভালোই তো জ্ঞান দিচ্ছ। বই আছে?'

'বই নাই। পদ্য আছে।'

'কোথায়?'

'আসো। তোমাকে দেখাচ্ছি।'

হৃদয় সুমনার হাত ধরে মার্কেটের সিঁড়িতে নিয়ে গেল। 'বসো। ওই যে ফুসকার দোকান। ফুসকা আসতেছে। তুমি ফুসকা খাও। আমি তোমাকে শক্তির পদ্য শোনাচ্ছি।'

'মানে?'

'মানে হলো' হৃদয় আবৃত্তি করতে লাগল—

আমার কাছে এখনও পড়ে আছে
তোমার প্রিয় হারিয়ে যাওয়া চাবি
কেমন করে তোরঙ্গ আজ খোলো?
থুৎনি পরে তিল তো তোমার আছে
এখন? ও মন নতুন দেশে যাবি?
চিঠি তোমায় হঠাৎ লিখতে হলো।

চাবি তোমার পরম যত্নে কাছে
রেখেছিলাম, আজই সময় হলো—
লিখিও, উহা ফিরৎ চাহো কিনা?

অবান্তর স্মৃতির ভিতর আছে
তোমার মুখ অশ্রু-ঝলোমলো
লিখিও, উহা ফিরৎ চাহো কিনা।

কবিতাটা হৃদয় ভালোই মুখস্থ বলে গেল। সুমনা মুগ্ধ। কে তাকে বলবে, ও মন। মুগ্ধ হয়ো না। কবিতা গান—এই সবই জীবনের শেষ কথা নয়।

সুমনা বলল, 'হৃদয়। তোমার এত সুন্দর গলা। আর কী মেমোরি তোমার। তুমি তো ফার্স্ট ইয়ারে আমাদের মধ্যে সবচেয়ে ভালো ছেলে ছিলা। ফাইনাল পরীক্ষার আগে আগে তোমার হলোটা কী?'

'আমার? আমার মোক্ষলাভ হয়েছে। পৃথিবীর কোনো মানে নাই মন। আমরা কেন বেঁচে আছি। কেন মরে যাই। আমরা কেউ জানি না। কিন্তু আমি জানি আমি কেন বেঁচে আছি। আর আমি জানি আমি কেন মরে যাব?'

'কী জানো?'

'ফর ইউ, আই ডু লিভ এন্ড ফর ইউ, আই এম গোয়িং টু ডাই...'

'কথা তুমি খুব ভালো বলো। তবে এইসব কোনো বাচ্চা মেয়েটেয়েকে বলো। পটে টটে যাবে। আমাকে বলার চেষ্টাই কোরো না।'

ফুসকা আসে। তারা ফুসকা খায়। সুমনার ভালোই লাগে। তার বড় ছককাটা নিরাপদ সাজানো জীবন। এই জীবনের বাইরে একটু এ রকম উল্টাপাল্টা হলে এক-আধবার— ক্ষতি কী?

ক্ষতি আছে সুমনা! ছেলেটা যে মাদকাসক্ত! আর সে তোমার পিছে লেগেছে তোমাকে সে ভালোবাসে বলে নয়। সে তোমাকে মাদকাসক্ত করে তোমার গাট্টি ভাঙতে চায়। তোমাকে ব্যবহার করতে চায়।

এই কথাটা কে এখন জানাবে সুমনাকে?

জানানোর লোকও জুটে যায়। সুমনার চেম্বারে গিয়ে একজন বললেন, 'আপা। আপনি যে হৃদয় লোকটার সাথে মিশতেছেন। আপনি জানেন ও কত বড় ড্রাগস এডিক্ট।'

'কী বলেন!'

'আরে ও টাকা ধার নেয় নাই এমন লোক নাই। চমৎকার চমৎকার মিথ্যা কথা বলে বলে ও টাকা ধার চায়। সবাই ওর যন্ত্রণায় এখন অস্থির।'

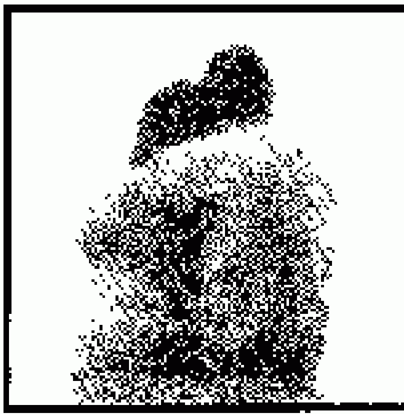
'বলো কি!'

'হ্যাঁ। আর ও আপনাকে টার্গেট করছে কারণ আপনি নাকি বড়লোক। আর আপনার নাকি মন নরম। ও আপনাকেও এডিক্টেড বানায়া আপনার টাকায় ওই সব গেলার পাঁয়তারা করতেছে।'

'কী বলো এইসব! আচ্ছা বলেছ ভালো করেছ।'

ছেলেটা বিদায় নিলে সুমনা চেয়ারে গা এলিয়ে দিল। সে তার শরীরে কোনো জোর পাচ্ছে না। হৃদয় ছেলেটা মাদকাসক্ত! এত ভালো একটা ছেলে ছিল, পড়াশোনায় ভালো ছিল, ভালো আবৃত্তি করত! তারপর তাহলে নেশাই তাকে নষ্ট করল! সেই কারণেই শেষের দিকে পরীক্ষায় আর ভালো করল না। ভালো করবে কী? ক্লাসেই তো আসত না! তাই তো, চাকরি বাকরি যদি বা করবে, বার বার এসে টাকা চাইবে কেন? আর কী রকম নোংরা হয়ে থাকে আজকাল!

না, এই ছেলেকে আর পাত্তা দেওয়া যাবে না। মাদকাসক্ত ছেলেদের সঙ্গীসাথীরা খারাপ হয়। আর ওদের মূল্যবোধ একেবারেই নষ্ট হয়ে যায়। এর সঙ্গে যোগাযোগ রাখলে সুমনার খারাপ বই ভালো হবে না! সে একজন শিক্ষিকা, তার ভাবমূর্তি মানসম্মান বলতে একটা জিনিস আছে। তার অবশ্যই চলাফেরায় আচার-আচরণে সংযত থাকা উচিত। অবশ্যই।



হৃদয় আর বন্ধুবান্ধবদের আড্ডা বসেছে যথারীতি। কেউ বসে আছে মেঝেতে পা ছড়িয়ে দেয়ালে ঠেস দিয়ে, কেউ বা একেবারে চিৎ হয়ে শোওয়া, কেউবা বসে আছে ধ্যানীর মতো। একটা নির্মাণাধীন মার্কেট ভবনের পেছনের দিকে, মানুষ যেখানে খুব আসে না, সেই রকম একটা পরিসরে। জায়গাটায় আলো কম। বাতাসও আসা-যাওয়া করতে পারে কম। সিগারেট ইত্যাদির ধোঁয়ায়

পুরো জায়গাটা গুমোট হয়ে আছে।

তারা গান করছে—

তোমার বাড়ির রঙ্গের মেলায় দেখেছিলাম বায়োস্কোপ
বায়োস্কোপের নেশা আমার কাটে না।
ডাইনে তোমার চাচার বাড়ি বাঁয়ের দিকে পুকুরঘাট
সেই ভাবনায় বয়স আমার বাড়ে না।

হৃদয়ের একজন সঙ্গী বলে বসল, 'হৃদয় মিয়া। ভালোই তো মাল বাগাইছ। সুমনারে খালি হাতে ধইরো না। একেরে হাতে ছাই দিয়া ধরো। তাইলে আর নেশার টাকার অভাব হইব না।'

হৃদয় হঠাৎ ক্ষেপে গিয়ে ওই বক্তার কলার চেপে ধরে বসল, 'ওই হারামজাদা। কী কইলি। আর কোনোদিন সুমনার সম্পর্কে যদি কোনো ফাউল টক করতে শুনি ... হারামজাদা'—

দুজনেই মেঝেতে গড়াগড়ি খাচ্ছিল, বাকিরা তাদের দুজনকে টেনে হিচড়ে আলাদা করে দিল।

হৃদয় গজর গজর করেই চলেছে, 'হারামজাদা কাকে নিয়া কী কইতে হইব জানে না হালায়। হালায় একটা ফাউল...'

'আচ্ছা হৃদয়ভাই চুপ করেন না। ও একটা ভুল করছে।' মধ্যস্থতাকারীরা হস্তক্ষেপ করে।

'এই ফাউলরে এই মার্কেটেই আইতে দিবা না। হালায় ফাউল'— গজরাতে গজরাতে হৃদয় উঠে চলে গেল বাইরে।

হৃদয় একটা নির্জন জায়গা দেখে দাঁড়াল। মার্কেটের দোতলার সামনের দিকের বারান্দা। এইখানটায় রোদ পড়েছে। নিচের রাস্তা দিয়ে গাড়ি-ঘোড়া ছুটে চলেছে আপন গতিতে। চলমান রাস্তার একটা শব্দ আছে। গাড়ির হর্ন, ইঞ্জিনের শব্দ। নাহ। এখানে নয়। আরো দুতলা ওপরে উঠতে হবে। অন্ধকার সিঁড়ি বেয়ে সে উঠল চারতলায়। এই জায়গাটা অনেকটাই শান্ত। হৃদয় পকেট থেকে মোবাইল ফোন বের করে কল দিল সুমনাকে।

সুমনা ফোন ধরল— 'হ্যালো।'

'মনসোনা। কেমন আছ তুমি?' মৃদুস্বরে বলল হৃদয়।

'শোনো তুমি আমাকে আর ফোন করবা না'—কণ্ঠে যথেষ্ট দৃঢ়তা এনে বলল।

'কেন?'

'দেখাও করবা না আমার সাথে।'

'কিন্তু কেন?'

'আছে কারণ। রাখি।' সুমনা ফোন কেটে দিল।

হৃদয় বার বার ফোন করার চেষ্টা করল। ফোন গেল না।

সুমনা মোবাইল অফ করে দিয়েছে। একটা লোক ফোন করছে তাকে, আর সে মুখের ওপরে ফোন বন্ধ করে দিয়েছে ভাবতেই মনের মনটা গভীর বেদনায় আচ্ছন্ন হয়ে উঠল।

তার ভীষণ কান্না পাচ্ছে।

এ অবস্থা থেকে নিজেকে রক্ষা করার উপায় হলো নিজেকে ব্যস্ত রাখা।

সুমনা পাশের ঘরে গিয়া ল্যান্ডফোন থেকে শুভ্রকে ফোন করল। আজকাল বিদেশে ফোন করাটাও সরকার সহজ করে দিয়েছে। দুই তিনবারের চেষ্টায় শুভ্রর ফোনটা বেজে উঠল।

'হ্যালো'— শুভ্রর গলা।

'শুভ্র ভাইয়া। কেমন আছেন?'

'হ্যাঁ সুমনা। ভালো আছি। তুমি অনেকদিন বাঁচবা। তোমার কথাই ভাবতেছিলাম।'

'বাহবা। আপনি তাহলে আমার কথা ভাবেন?'

'কী বলো! আমি তো সারাক্ষণই তোমার কথাই ভাবি।'

'তাইলে থিসিসের কাজ করছে কে?'

'আমিই করতেছি। কাজ করতেই করতেই তোমার কথা ভাবতেছি। কখন যে থিসিস পেপারের ভিতরে তোমার নাম মন লিখে ফেলি।'

'তাই নাকি! এই অবস্থা। তাহলে ফোন করেন নাই কেন। কার্ড কেনা হয় নাই?'

'সেইটা একটা কারণ বটে।'

'কার্ড না কিনে সরাসরি ফোন করা যায় না?'

'যায়। খরচটা একটু বেশি পড়ে...'

'খরচ বেশি পড়লে তো খুবই অসুবিধা...'

'অসুবিধা। না অসুবিধা কী?'

'তাহলে করেন না কেন?'

'আচ্ছা করব।'

'তাহলে এখন আমি রাখি। আপনি ফোন করেন দেখি।'

'ও হ্যাঁ। এতক্ষণ তো তোমার কলে কথা বলতেছিলাম। তোমার অনেক টাকা বিল আসবে।'

'তা আসুক। সেটা নিয়ে আপনাকে ভাবতে হবে না।'

'আচ্ছা তুমি রাখো। আমি ফোন করতেছি।'

'আচ্ছা রাখতেছি। দেখি করেন কিনা...'

'না আর কেন করব। তোমার সাথে কথা তো হয়েই গেল। আর কোনো কথা আছে?'

'আমার কোনো কথা নাই। কিন্তু আপনার কোনো কথা নাই?'

'না মানে কথা তো হলোই।'

'রাখলাম তাহলে। কথা যখন হয়েই গেছে...আমি বরং তোমাকে মেইল করছি।'

'মেইল করবেন? অনেক টাকা খরচা হয়ে যাবে না?'

'না তো। মেইল করতে তো টাকা লাগে না। এটা তো...'

সুমনা হেসে উঠল খিলখিল করে।

'এই হাসছ কেন। আমি রাখি।' শুভ্র ফোন কেটে দিল।

সুমনা ফোন রেখে মাথা নাড়ে। একটা লোক এত সরল হয় কী করে?



কিন্তু হৃদয় দেখা যাচ্ছে নাছোড়। সে সুমনার পিছ ছাড়ছে না। সুমনা তার চেম্বার থেকে বেরুনো মাত্র হৃদয় তার পিছু নিয়েছে।

সুমনা কণ্ঠে বিরক্তি ফুটিয়ে বলল, 'শোনো। তুমি আর আমার কাছে আসবা না?'

হৃদয় আকাশ থেকে পড়ল, 'কেন?'

সুমনা বলল, 'দেখো। একটা লোক এডিক্টেড হতেই পারে। সেইটাকে আমি একেবারে বড় করে দেখছি না। কিন্তু তুমি আমাকেও এডিকশন ধরিয়ে দিতে চাইবা, যাতে তোমার টাকার অভাব না হয়, সেইটা আমার খুব খারাপ লেগেছে।'

'কে বলল তোমাকে?'

'কথা সত্য কিনা বলো। এই জন্যে তুমি আমার পিছু নিছলা কিনা বলো।'

'আমি তোমাকে মিথ্যা বলব না। আমি সেই জন্যেই তোমার কাছে আসছিলাম। কিন্তু তোমার কাছে এসে তোমার সাথে দিন দুই মিশে আমার মন বদলে গেছে। আমি এখন তোমার কাছে আসছি ভালো হবার জন্যে। মন। আমি ভালো হতে চাই। তুমি আমাকে ভালো করে তোলো।'

'আমি তোমাকে কীভাবে ভালো করে তুলব। এই সব বাদ দাও। বরং আমার কথা শোনো। আমি একটা ইউনিভার্সিটিতে পড়াই। মাস্টারনি মানুষ। তুমি যদি আমার কাছে আসো নানা রকমের কথা হবে। তুমি বরং এইসব এডিকশন ছেড়ে দাও। একেবারে সুস্থ হয়ে তারপর আমার কাছে আসো। তখন আমি তোমার কথা শুনব। তোমার সাথে কথা বলব। তার আগে আমি তোমার সাথে কথা বলব না। তোমার সঙ্গে মিশব না। তোমাকে আমার আশেপাশে ঘেষতেও দিব না।'

'সুমনা শোনো। আমি সত্যি ভালো হতে চাই। কিন্তু একা একা ভালো হওয়া যায় না। কারও না কারও হেল্প লাগে। তুমি যদি চাও আমি ভালো হই, তাহলে আমাকে সাপোর্ট দাও। তোমার সাপোর্ট পেলে আমি ভালো হয়ে উঠব। নাহলে আমি আরও নষ্ট হয়ে যাব।'

'যাও তো। সবাই তাকিয়ে তাকিয়ে দেখছে। যাও।'

'সুমনা আমি বাঁচতে চাই। তুমি আমাকে বাঁচাও। মন প্লিজ।'

'তুমি আমাকে ব্লাক মেইল করার চেষ্টা করছ। যখন তুমি এই সব শুরু করো তখন কি আমার কাছে জিজ্ঞেস করে তারপর শুরু করেছিলে? তাহলে এখন কেন আমার কাছে এসেছ?'

'যাও।'

সুমনা মোবাইলে ড্রাইভারকে মিসকল দিল। গাড়ি দ্রুতই চলে এলো তাদের কাছে।

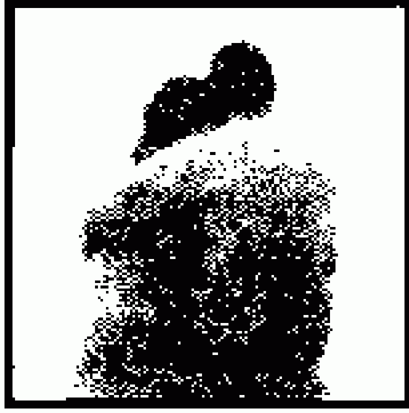
সুমনা গাড়িতে উঠে বসে দরজা লাগিয়ে দিল। গাড়ি চলতে লাগল।

ভীষণ দুখী চেহারা করে হৃদয় দাঁড়িয়ে রইল দুই ভবনের মাঝখানের

চত্বরটায়। ভবন দুটো ভীষণ উঁচু। তার পাশে মানুষগুলোকে যে কী ছোট দেখাচ্ছে। হৃদয় আকাশের দিকে তাকাল। আকাশটাও নিচু হয়ে আছে, ভাদ্রের মেঘের ভারে।

আকাশটা কি আরেকটু উঁচু হতে পারত না, আমি যে সোজা হয়ে দাঁড়াতে পারছি না, হৃদয় হেলাল হাফিজের কবিতা থেকে ধার করে বিড় বিড় করতে লাগল।

তার 'বেড়া' উঠছে। তার জিভ শুকিয়ে আসছে। শরীর কাঁপছে। এখন তার নেশা করা দরকার। সে ছুটতে আরম্ভ করল আস্তানার উদ্দেশে।



বাইরে বৃষ্টি পড়ছে। ভাদ্রের আকাশের কোনো নিশ্চয়তা নেই। এই রোদ এই বৃষ্টি! এখন এই সন্ধ্যার সময় ঝুম বৃষ্টি! আশে পাশের বাড়ির আলো এসে পড়েছে বাড়ির পেছনের কদম গাছটায়। বৃষ্টির ঝাপ্টায় পাতাগুলো কীভাবে কাঁপছে। কালচে সবুজ পাতা। রেনুঝরা কদমের গোলক।

সেই দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে সুমনার মনটা কী রকম ব্যথাতুর হয়ে উঠল। হৃদয় ছেলেটাকে সে এইভাবে ফিরিয়ে দিল। কাজটা কি সে ঠিক করল?

ফার্স্ট ইয়ারে যখন তারা ছিল, ডিপার্টমেন্টের পিকনিকে গিয়েছিল চন্দ্রায়, জাতীয় উদ্যানে, তখন হৃদয় ছেলেটা মাউথ অর্গানে রবীন্দ্রসংগীতের সুর তুলেছিল, পুরোনো সেই দিনের কথা ভুলবি কি রে হায়, সেই সুর সেই বাদন সবাইকে মুগ্ধ করে দিয়েছিল। আর পড়াশোনাতেও তো ভীষণ ভালো ছিল সে। তাদের ক্লাসে তো বেশি সংখ্যক ছেলেমেয়ে ফার্স্টক্লাস পায়নি, অল্প সংখ্যকই পাচ্ছিল, হৃদয় ছিল সেই অল্প সংখ্যকের একজন। সবাই তাকে পছন্দ করত। এই ছেলে নেশা ধরল কেন? বৃষ্টির ঝাপটা এসে লাগে সুমনার চোখেমুখে। তার মুখ ভিজে যাচ্ছে। তবু সুমনা বারান্দা থেকে নড়ছে না। কাজটা সুমনা কি

ঠিক করল?

একজন মানুষকে, ক্লাসমেটকে, একটা তরতাজা যুবককে কি এইভাবে কেউ অপমান করতে পারে।

সুমনার চোখ ভিজে আসছে। এ ছাড়া সে কীই বা করতে পারত?

বৃষ্টির জল এসে তার চোখের জল ধুয়ে দিতে লাগল।



হৃদয়ের ফোন কয়েকদিন ধরল না সুমনা। এর মধ্যে হৃদয়ের পাঠানো অনেকগুলো এসএমএস এসে তার মোবাইল ফোনের মেসেজের ইনবক্স ভরে উঠল। হৃদয় লিখেছে, তুমি শুধু একবার আমার সাথে কথা বলো, আমি নেশা ছেড়ে দেব। সুমনার মনটা একেকবার দুর্বল হয়ে আসে। মনে হয় ওর সঙ্গে কথা বলে। কিন্তু আবার নিজেকে শাসন করে। ঝামেলায় জড়িয়ে যাওয়ার দরকার কী তার?

শুভ্রর সঙ্গে কথা হচ্ছে প্রায়ই। ভদ্রলোক মনে হয় কিপ্টেমির স্বভাবটা পরিত্যাগ করেছেন। তিনিই ফোন করেন। ওরা দুজনে গল্প করে। সেই সব গল্পের কোনো মাথামুণ্ডু থাকে না। বিষয়ের কোনো নির্দিষ্টতা নেই। গল্পের গরু যে কোন গাছে উঠে কোন পাতালে নেমে যায়!

এরই মধ্যে ল্যান্ডফোনে একটা ফোন এলো একদিন।

সুমনা ফোনটা কানে দিয়ে অভ্যাসমতো হ্যালো বলার পর টের পেল ওপাশে হৃদয়।

হৃদয় বলল, 'মন, একটা গুড নিউজ দেবার জন্যে আমি ফোন করেছি। আমি ড্রাগস ছেড়ে দিয়েছি।'

'সত্যি?'

'হ্যাঁ। গত ১০ দিনে আমি কিছুই নেইনি। এমনকি একটা সিগারেট পর্যন্ত না?'

'ভেরি গুড। কংগ্রচালুশেন্স।'

'অল ক্রেডিট গোস টু ইউ। তুমি আমাকে বলেছিলে না এই সব ছেড়েছুড়ে দিয়ে তারপর যেন তোমার সাথে যোগাযোগ করি। সে জন্যেই এই কঠিন কাজটা আমি করতে পারছি। এখন নিশ্চয়ই আমি তোমার সাথে দেখা করতে পারি।'

'আচ্ছা এসো। তবে আবার কিন্তু ড্রাগস ধরে ফেলো না। একবারও ট্রাই করবা না।'

'তুমি আমাকে না করছ আর ওই জিনিস আমি ধরে ফেলব। মাথা খারাপ নাকি আমার। শোনো তুমি যা বলবা আমি তাই করব। তুমি যদি বলো আগুনে হাত দিতে আমি দিব। আমার হাত একটুও কাঁপবে না।'

'না না। আগুনে হাত দিতে হবে না। যে আগুনে হাত দিয়েছিলে সেখান থেকে সেটা সরাও। ব্যাস।'

পরের দিনই হৃদয় চলে এলো সুমনার চেম্বারে। সোজা এসে টেবিলের উল্টোদিকের চেয়ারে বসে বলল, 'মন আমি সব কিছু ছেড়ে দিয়েছি। আই এম এ ফ্রি ম্যান নাউ।'

'রিয়েলি। এইটা যে তুমি পারলা, আমি যে কী খুশি হইছি। এখন চেহারা সুরতটা একটু ভালো করো। এমন চেহারা বানিয়ে রেখেছ।'

'আস্তে আস্তে। প্রথমে তো এডিকশনটা তো ছাড়ি। এইটাই অনেক কঠিন। সবাই পারে না। আমি যে পারলাম তার কারণ তুমি। তুমি যদি আমাকে ইন্সপায়ার না করতা...'

'আমি মোটেও তোমাকে ইন্সপায়ার করিনি।'

'আরে তোমার সাথে যে আমার দেখা হইছে, এইটাই অনেক বেশি ইন্সপিরাশন। আর লাগে না। কোন পুণ্য বলে যে এতদিন পরে হঠাৎ করে তোমার দেখা পেলাম।'

'তুমি কতজনকে পটিয়েছ বলো তো। তোমার বাকপ্রতিভা তো অসাধারণ!'

'মন, শোনো, ইয়ে মানে আসার সময় না আমি মানিব্যাগটা কোথায় ফেলে এসেছি। খুঁজে পাচ্ছি না। ট্যাক্সিভাড়া দিতে পারি নাই। ট্যাক্সিটা বাইরে দাঁড়িয়ে আছে। তোমার কাছে শ দুয়েক টাকা হবে।'

সুমনার কেমন যেন সন্দেহ হলো। সে বলল, 'চলো, দেখি কোথায়

তোমার ট্যাক্সিওয়ালা।'

হৃদয় বলল, 'চলে গেছে। আমি আমার পরিচিত একটা সিগারেটওয়ালার কাছ থেকে ধার নিয়ে দিয়েছি। সিগারেটওয়ালাটা বাইরে আছে।'

সুমনা বলল, 'আচ্ছা চলো ওই সিগারেটওয়ালাকেই টাকাটা সরাসরি দিয়ে আসি।'

'তুমি আমাকে বিশ্বাস করছ না?'

'না বিশ্বাস করব না কেন। তুমি তো অবশ্যই সত্য কথা বলেছ। চলো যাই সিগারেটওয়ালার কাছে।'

'না। তোমার কাছে আমি আসি একটু ইন্সপায়ার হওয়ার জন্য। আর তুমি আমাকে ডিমরালাইজ করছ। চলে যাই।'

'না যাবে কেন। বসো।'

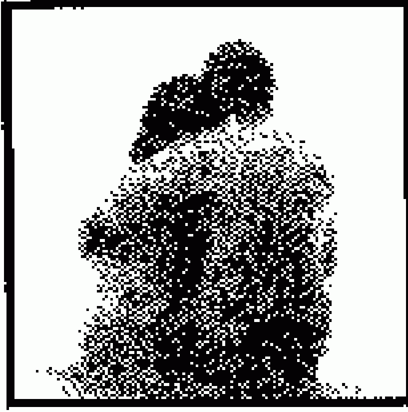
'না আমাকে তো টাকাটা দিতে হবে তাই না। যাই টাকাটা নিয়ে আসি।'

'না বসো।'

'ধেত্তেরি। দাও না বাবা টাকাটা। আমাকে যেতে হবে।'

'টাকা হবে না। যাও।'

হৃদয় চলে গেল। মুখটা তেতো হয়ে রইল সুমনার।



সুমনা তার কম্পিউটারের সামনে বসল। ইন্টারনেটে সার্চ করল ড্রাগস এবিউজ বিষয়ে। বহু তথ্য পেল। জানতে পারল, ড্রাগস এডিকশন থেকে মুক্তি পাওয়া সহজ নয়। ব্যাপারটা কঠিন, কিন্তু অসম্ভব নয়। মাদক থেকে মুক্তি পেতে যা লাগে, তা হলো দৃঢ় প্রতিজ্ঞা। মাদকাসক্তকে প্রথমে নিজের ভেতর থেকে উদ্বুদ্ধ হতে হবে যে সে নেশা ছাড়বে। তারপর তাকে ডাক্তারের তত্ত্বাবধানে ও পরামর্শে চলতে হবে। প্রথমে একজন মাদকাসক্তকে ডিটক্স করা হয়। ৩ থেকে ১৪ দিন লাগে এই পর্বে। এটা সাধারণত করা হয় ডাক্তারের তত্ত্বাবধানে

কোনো নিরাময় কেন্দ্রে রেখে। তারপর শুরু হয় রিহ্যাব। সেটায় অনেক দিন লেগে যায়।

যে মাদক ছাড়তে চায়, রিহ্যাবের সময় তার পুরোনো বন্ধুদের ছাড়তে হবে। বেশির ভাগ ক্ষেত্রে মাদকাসক্তরা নেশা ছেড়ে দেবার কিছুদিনের মধ্যেই আবার নেশার দাসত্বে ফিরে যায়।

আর তাদের একটা লক্ষণ হলো তারা খুব গুছিয়ে মিথ্যা কথা বলতে পারে। মাদকের অপকারিতা সম্পর্কে তারা আবার অন্যদের চেয়ে বেশি জানে। এই বিষয়ে তারা অন্যদের খুব ভালো লেকচার দিতে পারবে। তারপরেও তারা নেশা ছাড়তে পারে না। কারণ মাদকের অনেকগুলো উপাদান তাদের শরীরে, তাদের রক্তে, তাদের দেহের কোষে, মস্তিষ্কে মাদকের ওপরে স্থায়ী নির্ভরশীলতা তৈরি করে। তারা ছাড়তে চাইলেও ছাড়তে পারে না। যদি বা ছাড়তে চায়, শরীরে খুব কষ্টকর প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়। তারা মাদকের অভাবে ভয়াবহ কষ্ট পেতে থাকে। এই জন্যে মাদক ছাড়ার জন্যেও ডাক্তারের পরামর্শমতো চিকিৎসা নিতে হয়। তবে চিকিৎসকের পরামর্শমতো মাদক ছাড়া গেলেও কিছুদিনের মধ্যে আবার তারা শুরু করে। মাদকাসক্তি মুক্তির তাই কোনো শর্টকাট পথ নাই। প্রথমে মাদক ছাড়ার শারীরিক সমস্যাগুলো ডাক্তারের তত্ত্বাবধানে মোকাবেলা করতে হয়। তারপর বহুদিন তাকে রিহ্যাব প্রক্রিয়ার মধ্যে থাকতে হয়। তারপরেও বহুদিন পরেও মাদক-ছেড়ে যাওয়া একজন মাদক আবার মাদকের কবলে পড়তে পারে। পুরোনো বন্ধুবান্ধব, ফোনকল তাদের মস্তিষ্কের মধ্যে মাদকের আমন্ত্রণ পাঠাতে থাকে।

বাপরে। পুরোটা পড়ে সুমনা বুঝতে পারল হৃদয়কে মাদক ছাড়াতে হলে কোনো নিরাময় কেন্দ্রেই নিতে হবে। শুধু তোমাকে কথা দিচ্ছি, আমি মাদক ছেড়ে দেব—এ কথা সে মন থেকে বললেও বাস্তবে তা পালন করতে পারবে না।

সুমনা মনে মনে একটা সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলল, হৃদয়কে সে কোনো একটা মাদক নিরাময় কেন্দ্রে ভর্তি করিয়ে দিয়ে আসবে। তা না হলে হৃদয় তো ধীরে ধীরে মৃত্যুর দিকে চলে যাবেই, সে ইউনিভার্সিটিতে সুমনার যে একটা সুখ্যাতি আছে সেটাও ধ্বংস করে ফেলবে। আজকে হৃদয় তার সঙ্গে যে আচরণ করছে, মিষ্টি মিষ্টি কথা বলছে, রেগে যাচ্ছে, এর সবই আসলে মাদকের প্রভাবে। নেশার দাসত্ব থেকে মুক্তি পেলে হৃদয় আশা করা যায় আর বিরক্ত করতে

আসবে না।

সুমনা ফোন করল হৃদয়কে। বলল, 'হৃদয় শোনো, তুমি কি একটু আমার সাথে দেখা করতে আসবে।'

হৃদয় বলল, 'একটু কেন, বেশি করেই দেখা করতে আসব। বলো কখন কোথায়।'

সুমনা বলল, 'আসো আমাদের বাসায় আসো।'

'এখনই আসব?'

'আসো।'

'আচ্ছা এক ঘণ্টার মধ্যেই আসতেছি।'

এক ঘণ্টা নয়, হৃদয় সুমনার বাড়ি এলো পরের দিন। এরমধ্যে সুমনা আবারও ফোন করল হৃদয়কে। বাসায় আসার জন্যে তাগাদা দিল। হৃদয় এলে সুমনা তাকে হাসিমুখে বৈঠকখানায় নিয়ে গিয়ে বসাল।

তারপর ধীরে ধীরে বলল, 'হৃদয়, শোনো, তুমি যদি আমার কাছে আসতেই চাও, আমার সাথে কোনো প্রকারের সম্পর্ক রাখতে চাও অবশ্যই তোমাকে একটা কাজ করতে হবে।'

হৃদয় বলল, 'বলো, কী কাজ। তোমার জন্যে আমি যেকোনো কিছু করতে রাজি আছি।'

'তুমি আমার সঙ্গে একটা মাদক মুক্তি কেন্দ্রে যাবে।'

'কেন। আমি তো ওই সব আর নিই না। সব ছেড়ে দিছি।'

'ভেরি গুড। তাহলে তোমাকে আর ডিটক্স করতে হবে না। এখন শুধু রিহ্যাবটা।'

'আরে আমি তো রিহ্যাবের মধ্যেই আছি। পুরোনো বন্ধুবান্ধব ছেড়ে দিয়েছি।'

'ঠিক আছে। তবু আমরা একজন ডাক্তারের কাছে যাব। ওনার পরামর্শ নেব। উনি যদি বলেন তুমি ঠিক আছ। তাহলে তো ভালোই।'

'ঠিক আছে। চলো।'

'এখনই চলো।'

'এখনই?'

'হ্যাঁ। আমার সঙ্গে ডা. মুনিরের কথা হয়ে আছে। উনি নিয়ে যেতে বলেছেন।' ঘড়ির দিকে তাকিয়ে সুমনা বলল, 'ওনাকে এখন ওনার চেম্বারেই

পাওয়া যাবে।'

'আজকে না। কালকে যাই।'

'না আজকেই চলো।'

'না কালকে।'

সুমনা কেঁদে ফেলল। বলল, 'হৃদয়। তুমি আমাদের বাসা থেকে চলে যাও। আর কোনোদিনও আমাদের বাসায় আসবে না। আমার চেম্বারে আসবে না। আমার সাথে কোনো রকমের কন্টাক্ট রাখার চেষ্টা করবে না। যাও।'

'না মানে ডাক্তারের কাছে গেলে ওনারা বলবেন রিহ্যাব সেন্টারে ভর্তি হতে। আমি তো এতদিন রিহ্যাবে থাকতে পারব না। আমার চাকরি বাকরি আছে না?'

সুমনা বলল, 'মিথ্যা কথা বোলো না। তোমার এত দামি চাকরিটা চলে গেছে। ইউএন জব। কত ভালো ছিল। সেই চাকরি তোমার চলে গেছে।'

হৃদয় বলল, 'তুমি কার কাছে শুনলা?'

'আমি সব খবরই পাই। আর তোমার মতো ভদ্রঘরের ছেলে এইসব করে বেড়াচ্ছ।'

'কী সব?'

'দোকান থেকে শপ লিফটিং করতে গিয়ে তুমি ধরা পড়েছ। দোকানিরা তোমাকে মার দিয়েছে। দেয়নি?'

'কী করব বলো। যখন বেরা ওঠে তখন তো আমি আর মানুষ থাকি না।'

'তারপরেও তুমি চিকিৎসা নিতে চাচ্ছ না কেন?'

'আচ্ছা চলো। তোমার সঙ্গে কোথায় যেতে হবে যাচ্ছি। শুধু একটা কথা বলো, তুমি আমাকে ভালোবাসো।'

'নিশ্চয়ই। না হলে তোমার ব্যাপারে আমি এত কেয়ারিং হচ্ছি কেন?'

'আমি ভালো হয়ে গেলে আমাকে তুমি ভালোবাসবে তো।'

'ও মা। ভালো হয়ে গেলে আমি কেন সবাই ভালোবাসবে তোমাকে।'

'সবার কথা আমি বলতেছি না। আমি বলতেছি তোমার কথা। তুমি ভালোবাসবা?'

'নিশ্চয়ই।'

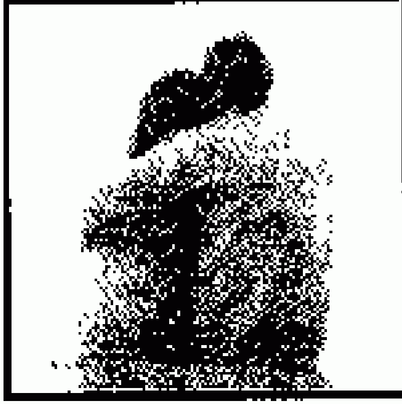
'চলো। ভালোবাসার জন্যে আমি যে কোনো কিছু করতে রাজি আছি। চলো। তবে আজকে না। কালকে যাব।'

'আবার কালকে কেন?'

'বাসায় বলে টলে আসি।'

'তোমার বাসার কারও সাথে যে তোমার সম্পর্ক নাই এটাও আমার জানা হয়ে গেছে হৃদয়।'

'আচ্ছা চলো।'



সুমনা হৃদয়কে নিয়ে গেল একজন মনোচিকিৎসক কাম মাদকাসক্তি নিরাময় বিশেষজ্ঞের কাছে। সুমনার পরিচিত ডাক্তার। চেম্বারের সামনে গিয়ে ভেতরে খবর পাঠাল সুমনা। ডাক্তার সাহেব ওদেরকে বসতে বললেন। রিসেপশনিস্ট জানাল, দুজনের পরে তাদের সিরিয়াল। তারা ওয়েটিং রুমে বসে টেলিভিশনে হিজলতমাল অনুষ্ঠানে পল্লীগীতি শুনল মন দিয়ে।

তারপর তাদের ডাক এলো।

ডাক্তার সাহেবের মাথায় টাক। তিনি কথা বলেন সুরে সুরে। সুরে সুরে কথা বলবার সময় তার মুখের দুপাশ থেকে একটু থুতুমতো বেরোয়। এটা বাহ্যিক। কারণ ডাক্তার হিসেবে তিনি খুবই ভালো। তার চিকিৎসা পেয়ে এ পর্যন্ত বহু মাদকাসক্ত মাদক ছেড়েছে এবং এখন তারা সুস্থ জীবন যাপন করছে।

ডাক্তার বললেন, 'পেসেন্ট কে?'

হৃদয় বলল, 'আমি।'

'নাম?'

'লুৎফর রহমান হৃদয়।'

'বয়স?'

'২৭।'

'সমস্যা কী বলেন।'

'স্যার আমি নেশা করি।'

'কী নেন?'

'ফেন্সি খাই।'

'কতদিন।'

'অনেক দিন। কয়েক বছর।'

'সর্বনাশ। এইটা তো খুব ক্ষতিকর। এতে আপনার বডির অনেকগুলো অরগ্যানের ক্ষতি হয়। আপনার কিডনি নষ্ট হবে, লিভার নষ্ট হবে, খিদে কমে যাবে, সেক্সুয়াল ডিজায়ার আর পাওয়ার কমে যাবে, আপনার চোখের ক্ষতি হবে আর ফাইনালি ফেন্সিডিল অ্যাফেক্ট করে গিয়ে ব্রেইনে। আপনি আস্তে আস্তে মানসিক রোগী হয়ে যাবেন। সিজোফ্রেনিক হয়ে যাবেন। সোজা বাংলায় পাগল হয়ে যাবেন। বুঝলেন।'

হৃদয় বলল, 'স্যার আমি ছাড়তে চাই।'

'আপনি সারার পথে অনেক দূর এগিয়ে গেছেন। এক নম্বর হলো আপনি স্বীকার করেছেন আপনি নেশা করেন। এইটা ফার্স্ট স্টেপ। দুই হলো আপনি ভালো হতে চেয়েছেন। এইটা সেকেন্ড। যে ভালো হতে চায় সে পারে। যে চায় না, তাকে অন্যের পক্ষে জোর করে ভালো করা কঠিন।'

'আমি স্যার ছাড়ব।'

'গুড। আপনি অমাদের এখানে এডমিশন নিতে পারেন। আমরা প্রথমে আপনাকে ডিটক্স করব। তারপর রিহ্যাব...'

'সুমনা যদি বলে আমি সব করব। মন, কী বলো...'

সুমনা বলল, 'অবশ্যই তুমি ভর্তি হবা। অবশ্যই। আপনারা ওকে ভর্তি করে নেন। বিল যা আসবে আমাকে বলবেন।'

হৃদয় বলল, 'ঠিক আছে। আমি গিয়া প্রিপারেশন নিয়া আসতেছি।'

সুমনা বলল, 'না। তুমি এখান থেকে সরাসরি যাবা। প্রিপারেশন যা লাগে আমাকে বলো। আমি সব এনে দিচ্ছি।'

সুমনা জানে, হৃদয় এই কথাই বলবে। ওদের এই রকমই বলার কথা। সে খুব মনটাকে শক্ত করে নিয়েছে। আজকেই এখান থেকে সরাসরি ভর্তি করিয়ে দিতে হবে হৃদয়কে।

তাই করা হলো। হৃদয় সরাসরি একটা মাদক নিরাময় কেন্দ্রে গিয়ে ভর্তি হলো।

একা একা ফেরার সময় গাড়িতে সুমনার মনটা খুব গভীর একটা বেদনায় বিদীর্ণ হতে লাগল। মানুষ কেন নিজে নিজে এইসব সমস্যা সৃষ্টি করে।

এমনিতেই এই পৃথিবীতে মানুষের দুঃখকষ্টের কোনো সীমা নেই। কতজনের কত দুঃখ। কত কষ্ট। কত বাচ্চার লিউকেমিয়া। কত বাচ্চা জন্মগতভাবে নানা প্রতিবন্ধিকতা নিয়ে জন্মাচ্ছে। রোজ দুর্ঘটনায় কতজনের অঙ্গহানি ঘটছে। চারদিকে কত অসুখবিসুখ মহামারী। এর মধ্যে একটা সমস্যা মানুষ নিজে কেন টেনে আনছে।

প্রতিবছর বাংলাদেশে নাকি ৬ হাজার কোটি টাকা খরচ হয় নেশার পেছনে। এই টাকার পুরোটাই যায় বিদেশে পাচার হয়ে। কারণ নেশা জাতীয় জিনিসের কমই এই দেশে উৎপাদিত হয়। ৬ হাজার কোটি টাকায় কতগুলো প্রাথমিক বিদ্যালয়, কতগুলো হাসপাতাল হতে পারে। এই অপচয়ের কোনো মানে হয়। এক নেশা থেকেই কত রক্তারক্তি, খুনখারাবি।

এই দেশে মা নিজে ভাড়াটে খুনী নিয়োগ করেছেন তার নিজে ছেলেকে খুন করতে।

এই দেশে ১২/১৩ বছরের স্কুল ছাত্র ঠিক সময়ে মাদক কেনার টাকা না পেয়ে বাবা-মার সামনে নিজের পেটে ভাঙা কাচের টুকরো ঢুকিয়ে নিজেকে হত্যা করেছে।

সুমনার দুচোখ ভরে হুহু করে কান্নার আসতে থাকে।



মাদক নিরাময় কেন্দ্রে যাচ্ছে সুমনা। হৃদয়ের সঙ্গে দেখা করতে।

বেশ গাছপালায় ঢাকা একটা দোতলা বাড়ি। বাইরে গাড়ি পার্কিংয়ের জায়গাও আছে। গাড়ি থেকে নেমে সে ধীরে ধীরে হেঁটে যায় রিসেপশনে। নিজের পরিচয় জানায়। কার সাথে দেখা করতে এসেছে, বলে।

একজন কর্মকর্তা হৃদয়কে নিয়ে আসেন ভিজিটর রুমে।

সুমনা হৃদয়কে বলে, 'এই যে তোমার জিনিসপাতি যা লাগে...'

হৃদয় ব্যাগটা হাতে নিয়ে বলে, 'মন। তোমাকে একটা কথা বলব। বলি?'

'বলো।'

'আই এম ইন লাভ উইথ ইউ। আই লাভ ইউ। আই লাভ ইউ। কী কিছু বলতেছ না যে?'

'আমিও তোমাকে ভালোবাসি হৃদয়।'

হৃদয় ভ্যা ভ্যা করে কাঁদতে লাগল— 'আমি একটা মানুষ। আমাকেও কেউ কি ভালোবাসতে পারে? আমি একটা মানুষ!'

সুমনা তাকে সাহস দেয়, বলল, 'কেঁদো না।'

হৃদয় বলল, 'নেশা ছাড়তে আমার খুব কষ্ট হচ্ছে। কিন্তু এইসব কিছুই নয়... এইসব কিছুই নয়। আমার তুমি আছ। আমি ভালো হয়ে যাব। চাকরি থেকে সাসপেন্ড করছে। ভালো হয়ে আবার গিয়া জয়েন করব। আমি তোমার জন্যে ভালো হয়ে যাব। আমি তোমার জন্যে আবার মানুষ হবো। এতদিন তো আমি অমানুষ ছিলাম। আমি একটা জানোয়ার ছিলাম...'

সুমনা বলল, 'নিশ্চয়ই তুমি ভালো হবে হৃদয়। কেন ভালো হবে না। হবে। তুমি তো কোনোদিনও খারাপ ছেলে ছিলে না। তুমি ছিলে আমাদের ক্লাসের ব্রাইটেস্ট বয়...'

একটা সময় মনকে বিদায় নিতে হয়।

'বাবা। তোমার সাথে কি আমি খানিকক্ষণ গল্প করতে পারি?' সুমনা বলল তার বাবাকে।

'নিশ্চয়ই। আয় বোস। বল, কী বলবি।'

'আমি তোমাকে একটা কথা বলি নাই। আমাদের একটা ক্লাসমেট ছিল হৃদয় নাম। ওকে আমি ক্লিনিকে ভর্তি করে দিয়েছি।'

'কেন। কী হয়েছে ওর?'

'ও বাবা মরতেই বসেছিল। নেশা করত। আমি ওকে ধরে-টরে রিহ্যাব সেন্টারে দিয়ে এসেছি।'

'শুধু রিহ্যাবে দিলেই তো হবে না। ফলো আপ করতে হবে। টেক কেয়ার করতে হবে। একটু খোঁজখবর করতে হবে।'

'জি বাবা, সেটাও করছি।'

'কর। কেন যে আজকালকার ছেলেমেয়েরা এই ভয়ঙ্কর জিনিসটার মধ্যে গিয়ে পড়ে!'

'বাবা, চারদিকে এই সব। এত ভয়াবহ ফাঁদ সব পাতা। আজকালকার

ছেলেমেয়েদের দোষ দিয়ে কী লাভ! খারাপ হওয়ার সব রাস্তা যে বাবা আমরা খোলা রেখেছি।'

'হ্যাঁ। সেই। সরকারের কিন্তু উচিত ড্রাগসের রুটটা বন্ধ করে দেওয়া। এত এভেইলএবল কেন হবে ড্রাগস। তাই না? সরকার চাইলে কি পারে না এই মাদকের নেটওয়ার্কটা ভেঙে দিতে?'

'চেষ্টা তো করতে পারে।'

'আসলে এটা একটা ইন্টারন্যাশনাল নেটওয়ার্ক। সারা পৃথিবীতেই এটা প্রবলেম। তবে আমাদের মতো গরিব দেশের এটা সাজে না। আমার মনে হয় সরকারের উচিত ড্রাগস ব্যবসায়ীদের বিরুদ্ধে ক্রাশ প্রগ্রাম হাতে নেওয়া।'

'ঠিক।'

'ড্রাগসের সাথে কিন্তু অনেকগুলো সোশাল ক্রাইম রিলেটেড। অনেক খুন খারাবি হয় ড্রাগস নিয়ে। চুরি ডাকাতি ছেচরামো থেকে শুরু করে আর্মস ডিলিং আন্ডারওয়ার্ল্ড। বহু কিছু। গভরনমেন্ট মাস্ট ডু সামথিং সিরিয়াস এন্ড স্ট্রিক্ট।'



সুমনা গেছে মাদক নিরাময় কেন্দ্রটিতে। সেন্টারের বাইরের গাছতলায় চেয়ার পেতে দেওয়া হয়েছে। সেইখানে বসে গল্প করছে হৃদয়ের সঙ্গে।

সুমনা বলল, 'কী অবস্থা এখন তোমার?'

'এখন তো অনেক ভালো। কষ্টের ফেইজটা পার করছি। আর অসুবিধা নাই। এখন আমি বরং অন্যদের উপদেশ দেই। ডাক্তার স্যার আমাকে বলে সবাইকে বুঝাতে। আমি বুঝাই।'

'ভালো তো।'

'এখন আমাকে ছেড়ে দিতে পারে। আমি তো আর ধরবই না। চাকরিতে জয়েন করব। এরপরে বাংলাদেশের বাইরে পোস্টিং নিব। বিদেশে চলে যাব। তোমার কোন দেশ পছন্দ বলো। আমি সেই দেশেই পোস্টিং নিতে পারব।'

'আমার পছন্দ? বাংলাদেশ।'

'বাংলাদেশ ছাড়া?'

সুমনা বলল, 'বাংলাদেশ ছাড়া? বাংলাদেশ।'

গাছের ওপরে একদল কাক। এই সময় তাদের কি মনে হলো, তারা তাদের বাথরুম করা শুরু করে দিল। সুমনা বলল, 'এই জায়গায় আর বসে থাকা যাবে না। এখনই মাথায় পড়ত।'

হৃদয় প্রাণ খুলে হাসতে লাগল। হো হো হাসি। হাসির চোটে তার চোখে জল এসে যাচ্ছে। হাসলে হৃদয়কে সত্যি সুন্দর লাগে। হাসির গমক কমলে সে বলল, 'এই কাকদের টার্গেট তো কখনও মিস হয় না। আজ যে হলো। বড়...হা হা হা...'

নিরাময় কেন্দ্র থেকে ফেরার সময় সুমনার মনে এক ধরনের তৃপ্তি এক ধরনের ভালো লাগার অনুভূতি কাজ করছিল। তার জন্যে তার উদ্যোগে তাদেরই একজন বন্ধু নেশার ভয়ানক জগত থেকে ধীরে ধীরে আলোর দিকে ফিরে আসছে, সেটা তো ভালো লাগবার মতোই একটা বিষয়। সারাটা সন্ধ্যা সেই ভালো লাগার আমেজটা তার হৃদয়কে আপ্লুত করে রাখল।



সকালবেলা ঘুম ভাঙল দোরঘণ্টির স্বপ্নে। এতক্ষণ ধরে বেল বাজাচ্ছে কে? বাবা এখনও নিশ্চয়ই মর্নিং ওয়াক করে ফেরেননি। গৃহপরিচারিকা কি বাথরুমে?

চোখ রগড়াতে রগড়াতে শোবার কাপড় সামলাতে সামলাতে সুমনা দরজা খুলল।

শুভ্র গেটে দাঁড়িয়ে।

সুমনা বলল, 'এই। এইটা কে?'

শুভ্র বলল, 'দ্যাখো। চলে এসেছি। তোমাকে সারপ্রাইজ দিব বলে চলে এসেছি। হা হা হা।'

সুমনা ধাতস্থ হওয়ার চেষ্টা করতে করতে বলল, 'আই এম রিয়েলি সারপ্রাইজড।'

'হা হা হা...কী বাসায় ভেতরে আসতে বলবা না?'

'আসেন আসেন...'

শুভ্রকে সুমনা ভেতরে নিয়ে গেল। বৈঠকখানা বসতে দিল।

শুভ্র ড্রয়িংরুমে সোফার একটা বালিশ কোলে তুলে নিয়ে বসতে বসতে বলল, 'আংকেল কেমন আছে?'

সুমনা বলল, 'ভালো।'

'কই?'

'মনে হয় হাঁটতে গেছেন। এসে যাবেন। আপনি বসেন আমি একটু চোখে মুখে পানি দিয়ে আসি। কী আশ্চর্য। এইভাবে কেউ আসে...'

'আরে বসো আগে। গল্প করি। কতদিন পরে দেখা। আংকেলের সাথেও দেখা করব। কথা বলব। উফ। বিদেশে মানুষ থাকে!'

'আমার তো তাই ধারণা।'

'দেখো তোমার জন্যে কী আনছি'

'কী?'

'চোখ বন্ধ করো।'

'কেন?'

'করো না বাবা।'

সুমনা চোখ বন্ধ করল। আর শুভ্র তাড়াতাড়ি একটা হিরার আংটি বের করে সুমনার হাতে ধরিয়ে দেবার নাম করে ফট করে আঙুলে পরিয়ে দিল।

আবদুস সাত্তার সাহেব এই সময় দরজায় এসে দাঁড়ালেন। উঁকি দিয়ে দেখলেন ভেতরে শুভ্র তার মেয়ের হাত ধরে বসে আছে।

তার মুখে একটা করুণ হাসি ফুটে উঠল।

শুভ্র বলল, 'এইবার চোখ খোলো।'

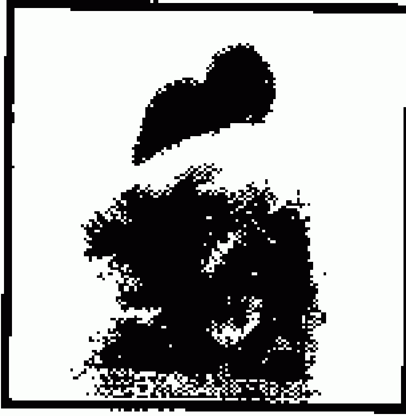
সুমনা বলল, 'এইটা আপনি কেন আনতে গেলেন?'

'কেন? অসুবিধা কী? আনতে পারি না আমি তোমার জন্যে।'

'জানি না।'

সুমনার কেন যেন খুব হৃদয়ের কথা মনে পড়ছে। সে বলল, 'মুখটা ধুয়ে আসি। আপনি বসেন। চা দিতে বলি। আমি আসছি।'

বাথরুমে ঢুকে আয়নায় নিজের মুখ দেখে সুমনা নিজেই হু হু কান্নায় ভেঙে পড়ল।



হৃদয়ের চিকিৎসকের সামনে সুমনা বসে আছে। ডাক্তার সাহেবের চেম্বারের টেবিলের ওপরে কাচ, কাচের নিচে নানা জনের ভিজিটিং কার্ড। সুমনা সেই দিকে তাকিয়ে আছে। কাচে ডাক্তার সাহেবের প্রতিবিম্ব পড়েছে।

ডাক্তার বললেন, 'হৃদয়কে কালকে ছেড়ে দিব।'

'ঠিক আছে এখন?' সুমনা জানতে চাইল।

ডাক্তার বললেন, 'আসলে কি জানেন, নেশা ধরাটা সোজা। ছাড়াটা খুব কঠিন। খুব। হৃদয় খুব ভালো করেছেন। খুব মনের জোর ওনার। অবশ্য আপনারও একটা বড় ভূমিকা আছে। তবুও এরপরের দিনগুলো আসল। ওকে ভালোবাসা দিয়ে আগলে রাখতে হবে। মাদক নিরাময়ে সবচেয়ে বড় ভূমিকা পালন করে স্বজনের ভালোবাসা।'

'ওর তো আত্মীয়-স্বজনরা সব বিদেশে। একা এই দেশে আছে ছেলেটা। ওও বাইরে চলে যাবে নিশ্চয়ই। গেলেই বাঁচি।'

'না। এই কথাটা ঠিক নয়। অনেক বাবা-মা তাদের ড্রাগস এডিক্টেড ছেলে মেয়েকে বিদেশে পাঠিয়ে ভাবেন, যাক বাঁচা গেল। বিদেশে ওরা ভালো থাকবে। বাস্তবে থাকে না। বিদেশেও ড্রাগসের সমস্যা আছে। বাইরে গিয়ে স্বাধীনতা পেয়ে ওরা আরও নষ্ট হয়। আরও কষ্ট পায়। দেশে ওদেরকে আগে একেবারেই সুস্থ করে তুলতে হবে। ব্লাড থেকে এলিমেন্টগুলো একেবারে চলে গেলে তারপর বিদেশে পাঠানো যেতে পারে।'

হায় এ কোন দায়িত্ব নিল সুমনা। হৃদয় তো তার কিছুই হয় না। শুধুই

একজন ক্লাসমেট মাত্র। সে যা করতে পারত তা সে করেছে। হৃদয়কে সে ক্লিনিকে এডমিশন করে দিয়েছে। ট্রিটমেন্টের খরচ বহন করছে। এরপরের দায়িত্ব তো সে নিতে পারে না। সে তো একটা ছোট্ট মানুষ। এত কিছু করার শক্তি তো তার নেই।

হৃদয়কে আজ দেখা যাচ্ছে অনেক তরতাজা। বহুদিন সে শরীরের ওপরে অনেক অন্যায়-অত্যাচার করেছিল। ক্লিনিকে থেকে নিয়মিত খাওয়া-দাওয়া ব্যায়াম-বিশ্রাম করায় তার চেহারায় লাবণ্য ফিরে এসেছে।

হৃদয় বলল, 'কালকে যখন ছাড়বে, তখন আমরা কী করব?'

সুমনা বলল, 'কী করতে চাও?'

'চলো কোথাও বেড়াতে-টেড়াতে যাই। কক্সবাজার যাবা?'

'না। আমার ইউনিভার্সিটি খোলা না?'

'তাইলে চলো কোনো একটা ওয়াটার পার্কে যাই। পানিতে ঝাপাঝাপি করলে মনে হয় হাতপাগুলো একটু খুলত।'

'আচ্ছা যাওয়া যাবে। আগে গিয়ে নিজের বাসায় ওঠো। বাসাটা একটু সুন্দর-টুন্দর করে গোছাও। যা নোংরা করে রেখেছিলে।'

হৃদয় লজ্জা পেল। সত্যি, নেশার কবলে পড়ে সে তার জীবনটাকে একটা পশুর জীবন আর চারপাশকে গোয়াল বানিয়ে রেখেছিল।

শুভ্রকেও সময় দিতে হচ্ছে সুমনার। বেচারি। বিদেশ থেকে কত উত্তেজনা নিয়ে বহুদিন পরে ফিরেছে।

শুভ্র মনের ড্রয়িং রুমে বসে বলল, 'মন চলো। দেশে তো কত কিছু হইছে। কোথাও বেড়াতে-টেড়াতে যাই।'

'কই যাবা?'

'যমুনা ব্রিজ চলো যাই। ওখানে নাকি একটা রিসোর্ট মতো হইছে। ওখানে গিয়া সারাদিন কাটাই। তোমার বাবাকেও নিব। আমার প্যারেন্টসদেরকেও নিব।'

'কবে যাবা?'

'কবে যাব। কালকে চলো।'

'কালকে না শুভ্র।'

'আচ্ছা তাইলে পরের দিন...'

'নেক্সট উইকে যাই।'

'নেক্সট উইক। আচ্ছা...'

'মন খারাপ করলা?'

'না মন খারাপ করব কেন। নেক্সট উইক ইজ ওকে।'

সুমনা বুঝতে পারছে, শুভ্রকে এবার কথা দিতে হবে। এত দূর থেকে শুভ্র স্রেফ সুমনার জন্যেই ছুটে এসেছে। তার আগে হৃদয়কে ঠিকঠাকমতো একটা কোথায় সেট্‌ল করাতে হবে। কঠিন কাজ। তার ছোট্ট ঘাড়ে এত সব কঠিন দায়িত্ব যে কোত্থেকে আসে।



হৃদয়কে মাদকমুক্তি কেন্দ্র থেকে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। হৃদয় এখন এক নতুন মানুষ। সুমনা তাকে নিজে গাড়িতে করে তুলে দিয়ে এলো তার সেজ আপার বাড়িতে। হৃদয়ের সেজ আপাই একমাত্র থাকেন দেশে। হৃদয় চাইছিল আলাদা বাসায় উঠতে, কিন্তু ডাক্তারের সঙ্গে পরামর্শ করে সুমনা ঠিক করল, সেজ আপার বাসাতেই সে উঠুক। একটা চাকরিতে সে সাসপেন্ড হয়ে আছে। সেইটা ফিরে পাওয়ার সম্ভাবনা আছে। সেটা ফিরে পেলে আর তার রিল্যাপ্স করার সম্ভাবনা কমে এলে ডাক্তারের পরামর্শ নিয়েই কেবল হৃদয় একা একটা নিজের বাসায় উঠতে পারে। আপার হাতে হৃদয়কে তুলে দিয়ে ফিরে আসার সময় সুমনা বলল, 'হৃদয় একটা কথা বলি।'

'বলো।'

'তুমি আমার মাথা ছোঁ।'

'ছুঁলাম।'

'তুমি কি আমাকে ভালোবাসো।'

'হুঁ। খুব।'

'তাহলে মাথা ছুঁয়ে বলো আর কোনোদিন ড্রাগস নিব না।'

'সত্যি সত্যি নিব না তো। বলা লাগবে না।'

'তবুও বলো।'

হৃদয় সুমনার মাথা ছুঁয়ে বলল, 'আমি আর কোনোদিনও ড্রাগস নিব না। নিব না। প্রমিজ প্রমিজ প্রমিজ।'

সুমনা বলল, 'থ্যাংক ইউ। এই কথার যেন কোনোদিনও অন্যথা না হয়।'

সুমনা এরপর চুপ করে রইল। সে ভেবেছিল, বলবে, আর যদি সুমনা কোনোদিন আসতে নাও পারে তার কাছে, তবু যেন সে নেশার সর্বনাশা জগতে এক মুহূর্তের জন্যেও ফিরে না যায়। বলা হলো না। এই কথা বলতে গিয়ে তার গলা ধরে আসছে। অথচ কথাটা তো তাকে একদিন বলতেই হবে। কী জানি, কবে বলবে। আজ নয়। কেবল রিহ্যাব সেন্টার থেকে ফিরেছে ছেলেটা। যাক না আগে কয়েকটা দিন।

শুভ্র খুবই উত্তেজিত। সে সুমনাকে বলল, 'শোনো। চারদিকে নানা কথা শুনি। আমি কয়েকটা দিন দেশের বাইরে ছিলাম। এই সুযোগে তুমি নাকি কোন হৃদয় না কার সাথে প্রেম করে বেড়াচ্ছ।'

সুমনা ঠাণ্ডা মাথায় বলল, 'তুমি উত্তেজিত। রেগে আছ। রাগ কমাও। আমি বলছি। সব বলছি। আমি তোমাকেই ভালোবাসি। তুমি সব শোনো। তারপর বলো...'

শুভ্র বলল, 'রাখো তোমার শোনাশুনি। আমি দেশে ছিলাম না, আর এই সুযোগে তুমি...ছি ছি ছি...!'

সুমনাও রেগে গেল। 'ছি ছি করছ কেন! আগে শোনো। একটা অসুস্থ লোক রাস্তার পাশে পড়ে আছে দেখলে তুমি গাড়ি থামাবে না? তাকে হাসপাতালে নেবে না? আমিও তাই করেছি। নাথিং মোর দ্যান দ্যাট...'

'তাই করেছ। ফ্লোরেন্স নাইটেংগেল। সেবার রানী। তাহলে এত কথা হচ্ছে কেন?'

'কোনো কথা হয় নাই। তুমি সব বলছ। আর কেউ বলে না।'

'আর কেউ বলে না। আর আমি সব বানিয়ে বলতেছি না? থাকো তুমি। আমি গেলাম। তোমার সাথে আর আমার কোনো সম্পর্ক নাই।' শুভ্র রেগেমেগে চলে গেল বাসা থেকে।

ভাগ্যি বাসায় বাবা ছিলেন না।

সুমনা নিজের ঘরের দরজা লাগিয়ে দিয়ে কাঁদতে শুরু করল। কান্নার দমকে তার শরীর ফুলে ফুলে উঠছে।

কয়েকটা দিন গেল শূন্যতার দিন। কয়েকটা দিন গেল বিষণ্ণতার দিন। বাইরে থেকে কিছুই বোঝা গেল না। যেমন ঝড়ের আগে সব থমথমে থাকে। তেমনি স্থির ভঙ্গিতে বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াতে যায় সুমনা। ক্লাস নেয়। টিউটোরিয়াল ক্লাসে ছেলেমেয়েদের এসাইনমেন্ট দেয়। খাতা দেখে। ঠিক সময়ে ঘরে ফেরে। হৃদয়ের ওখানেও যায় না। শুভ্রর সঙ্গেও যোগাযোগ করে না। হৃদয় অবশ্য ফোন করে। সুমনা স্বাভাবিক ভঙ্গিতে তাকে সদুপদেশ দেয়। যেমন করে ডাক্তার উপদেশ দেন আত্মীয় কোনো রোগীকে।

তারপর শুভ্র এলো বাসায়। প্রথমে দুজনেই গম্ভীর। কেউ কারো সঙ্গে কথা বলে না। কোথা থেকে কথা শুরু করা যাবে যেন দুজনের কেউই জানে না। শেষে শুভ্রই বলল, 'আমি স্যরি।'

সুমনা চোখ তুলে তাকাল।

'আমি স্যরি। আমরা বিয়ে করে ফেলব। তুমি তোমার বাবাকে বলো। আমি আমার ফ্যামিলিকে বলি। দিনক্ষণ ঠিক করে ফেলুক।'

সুমনা তাকিয়েই রইল।

'তবে একটাই শর্ত।'

'শর্ত?'

'শর্ত?'

'শর্ত না ঠিক। অনুরোধ। তুমি হৃদয়ের সাথে আর সম্পর্ক রাখবা না। তার সাথে দেখা করবা না। তার ফোন রিসিভ করবা না।'

'তুমি ভুল বুঝছ শুভ্র। হৃদয়ের সাথে আমার এমন কোনো সম্পর্ক না যেটা নিয়ে তোমার মন খারাপ মেজাজ খারাপ করতে হবে।'

'আমিও তো তাই বলছি। তোমার সাথে ওর কোনো সম্পর্ক নাই। নাই যদি তাহলে তুমি তার সাথে যোগাযোগ বন্ধ করতে পারবে না কেন?'

'পারব না তো বলি নাই। বলেছি সম্পর্কটা এত ইনসিগনিফিকান্ট যে এটা নিয়ে কোনো কথা হওয়াই উচিত না।'

'যাই হোক, কথা যখন উঠেছে, তখন তুমি ওর সাথে কথা বলা এখনই বন্ধ করে দিচ্ছ না কেন?'

'আচ্ছা দেব।'

'এইটা কিন্তু ফাইনাল। তুমি আর ওর সাথে সম্পর্ক রাখবা না। কোনো

রকমের কন্টাক্ট না। কমিউনিকেশন না। আর আমরা বিয়ের ডেট ফাইনাল করে ফেলছি। ঠিক আছে।'

'ঠিক আছে।' সুমনার মনের মধ্যে নানা চিন্তা। এই সময়টার মুখোমুখি তাকে হতেই হবে সে জানত। সময়টা এসে গেছে। তাহলে হৃদয়কে তার বলে দেওয়া উচিত সামনে তার বিয়ে। সে যেন নিজের পায়ে নিজের মতো করে চলে। আর যদি সে সত্যি সত্যি সুমনাকে ভালোই বেসে থাকে, তাহলে যেন আর কোনোদিন নেশার জগতে ফিরে না যায়।

'কী কথা বলতেছ না যে!' শুভ্র বলল।

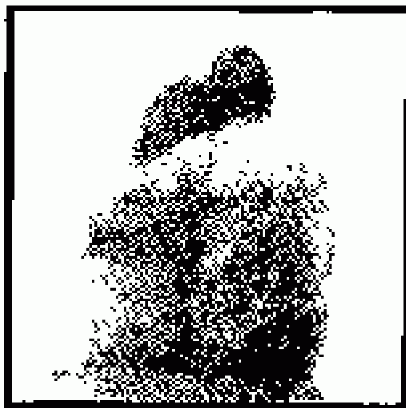
'না আর কী কথা বলব। কথা তো ফাইনাল। আমি আর হৃদয়ের সাথে কথা বলব না। কোনো রকমের কন্ট্যাক্ট রাখব না। ব্যস। এরপর আমাদের বিয়ে। আমরা সুখে-শান্তিতে বসবাস করিতে থাকিব।'

'আর ওয়েবে বসো আজকেই। স্কলারশিপের এপ্লিকেশন ফরমটা অন লাইনে ফিলআউট করো। তোমার যা রেজাল্ট তোমাকে তো ওরা সেধে নিয়ে নেবে। নেক্সট সেমিস্টার থেকেই তুমি ক্লাস শুরু করে দিতে পারবা।'

'সেই ভালো। এই দেশে আর ভালো লাগে না।'

'চলো বাইরে কোথাও খেতে যাই। বাইরে গেলে তোমার মনটা ভালো হবে।'

'চলো। তুমি একটু বসো। আমি রেডি হয়ে আসছি।'



আবদুস সাত্তার সাহেব টেলিভিশনে ক্রিকেট খেলা দেখছেন। অস্ট্রেলিয়ার সঙ্গে দক্ষিণ আফ্রিকার খেলা। ভদ্রলোকের অনন্ত অবসর। তিনি ক্রিকেটটাকে তার সময় কাটানোর একটা উৎকৃষ্ট উপায় হিসেবে গ্রহণ করেছেন।

সুমনা বাবার পাশে গিয়ে বসল। টিভির দিকে তাকাল। খেলার কোনো কিছুই তার মাথায় ঢুকছে না। খেলায় চা-পানের বিরতি দিলে বিজ্ঞাপন শুরু হলো।

বাবা বললেন, 'আজকে মনে হয় অস্ট্রেলিয়া হারবে।'

সুমনা কোনো কথা বলল না।

বাবা বললেন, 'কী রে মা, তোর মন খারাপ?'

'বাবা আমার খুব কষ্ট হচ্ছে।'

'কী বলিস, কেন?' বাবা মেয়ের মাথায় হাত রেখে বললেন।

'বাবা। আজকে হৃদয় ছেলেটাকে আমি না করে দিব।'

'দিতে তো হবেই। শুভ্র তো অনেক দিন ধরে তোর কাছে আসে টাসে। এখন তো এসেছে। রিং পরিয়েছে।'

'কিন্তু আমার যে ভয় হচ্ছে। হৃদয় যদি আবার নেশা ধরে।'

'এইটা তো ব্লাকমেইলিং হয়ে গেল। তাই না। তোর যাকে ভালো লাগে, যার সাথে তোর রিলেশনে কমিটমেন্ট আছে, রেসপনসিবিলিটি আছে, তাকেই তো হ্যাঁ বলবি। তাই না। তোর নিজের সুখটাও তো তোকে দেখতে হবে।'

'বাবা আমি জানি না আমি কী করব। বাবা এখন হৃদয় যদি বলে আমি ওকে ব্লাক মেইলিং করেছি। ওকে মিষ্টি মিষ্টি কথা বলে ক্লিনিকে ভর্তি করিয়ে দিয়ে এখন সরে পড়ছি।'

'সেটা তো ব্লাক মেইলিং হলো না। সেটা হলো হোয়াইট মেইলিং। তাকে তুই ভালো করতে চেয়েছিস। এতে তো অন্যায় কিছু নাই।'

সুমনার চোখ দিয়ে জল গড়াতে আরম্ভ করল। বাবা তাকে বুকে জড়িয়ে ধরলেন। এই মেয়েটির তো বাবা ছাড়া আর কেউ নেই। তিনি তাকে এমনভাবে মানুষ করার চেষ্টা করেছেন যেন তার গায়ে ফুলেরও আঘাত না লাগে। আজ মেয়েটা একটা বাস্তবিক মুশকিলে পড়েছে। তিনি জানেন না কী বললে মেয়েটার শুশ্রূষা হবে।

বাইরে বৃষ্টি শুরু হয়। বিদ্যুৎ চলে যায়। আকাশের বিদ্যুৎ চমকাতে থাকে। তারই আলো হঠাৎ হঠাৎ এসে ঢোকে বাড়ির ভেতরে। আর কী ভীষণ রকম আওয়াজ হয় বিদ্যুৎ চমকালে।

আজ হৃদয়ের সঙ্গে সুমনার শেষ দেখা। হৃদয়কে সুমনা ডেকে নিয়ে এসেছে ধানমণ্ডি লেকের পাড়ে একটা রেস্টুরেন্টে। এই রেস্টুরেন্টে পড়ন্ত দুপুরে লোকজন খুবই কম থাকে।

তারা লেকের পাড়ে খোলা আকাশের নিচে বসে। হেমন্তের আকাশটা আজ পরিচ্ছন্ন। আগের রাতে বৃষ্টি হয়ে যাওয়ায় রোদে ঝকঝক করছে পৃথিবী।

লেকের পানিতে নীল আকাশের ছায়া পড়ে সেটাকেও দেখাচ্ছে একটা পরিষ্কার আয়নার মতো।

সুমনাও পড়েছে সাদা পোশাক। একটা উজ্জ্বল খামের ওপরে তাকে দেখাচ্ছে একটা ঝকঝকে ডাকটিকেটের মতো।

হৃদয় বেশ মোটাসোটা হয়ে গেছে। গাল ফুলতে শুরু করেছে। বোঝা যাচ্ছে, আপা তার যত্নআত্তি করছেন ভালোই।

ওয়েটার দু কাপ কফি দিয়ে গেছে। তাই সামনে নিয়ে বসে আছে দুজন।

সুমনা একটা ছোট্ট প্যাকেট হৃদয়ের হাতে দিয়ে বলল, 'হৃদয়। তোমার জন্যে আমি একটা গিফট এনেছি।'

'কী জিনিস?'

'একটা হারমোনিকা। তুমি এইটা বাজাবা। তোমার মনে আছে ফার্স্ট ইয়ারের পিকনিকে তুমি হারমোনিকায় একটা রবীন্দ্রসংগীত বাজিয়েছিলে।'

'সেই কথা তুমি এখনও মনে করে রেখেছ।'

'তুমি জানো আমি ভালো ছাত্রী। আমার মেমোরি শার্প।'

'বাপরে। সেটা তো তোমার রেজাল্টই বলছে।'

'হৃদয়, তুমি একটা অসাধারণ ছেলে। নিজের ওপরে তোমার কনট্রোল অসাধারণ। আমি জানি জীবনে আর কোনো দুঃখকষ্ট আনন্দই তোমাকে আর নেশা ধরাতে পারবে না। পারবে?'

'এই কথা কেন উঠতেছে?'

'হৃদয়, কথা ঘুরিও না। তুমি আমার মাথা ছুঁয়ে বলেছ, তুমি আর নেশা ধরবে না...'

'না, ধরব না তো।'

'শোনো। আমার পক্ষে তোমার কাছে আর হয়তো আসা সম্ভব হবে না।'

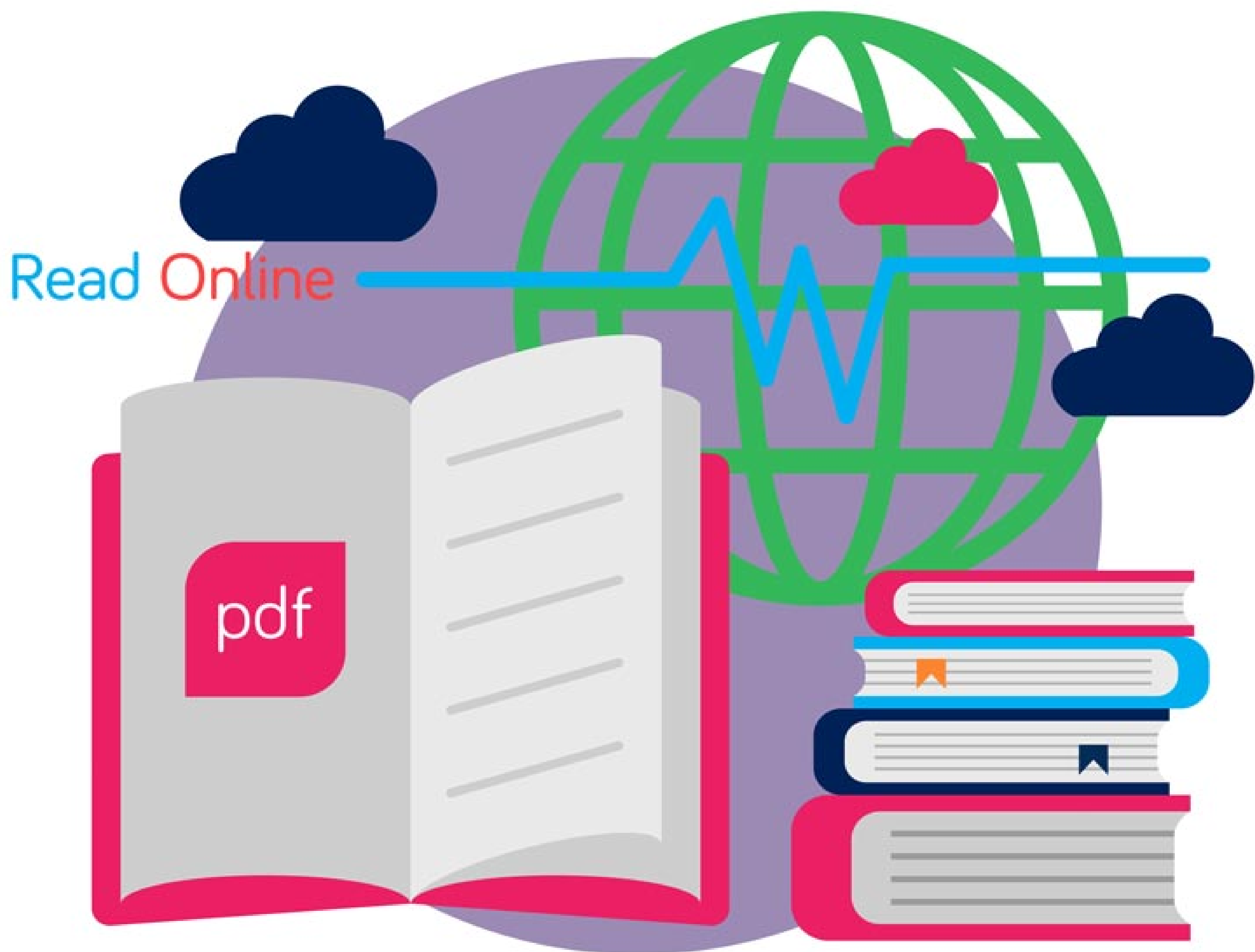
'কেন না। জানতে পারি?'

'না। পারো না। এইটা তোমার পরীক্ষা। এই পরীক্ষাতে যদি তুমি ফেইল করো, আমি তোমাকে থুতু দিতেও আসব না। কিন্তু যদি পাস করো, আমি তোমার জন্যে দূর থেকে অনেক উইশ পাঠাব। বেস্ট উইশেস' ... সুমনা কথা শেষ করতে পারে না। কান্না এসে তার গলা বুজে দিচ্ছে।

সুমনা কাঁদতে লাগল।

হৃদয়ের চোখও ভিজে এলো।

তখন নীলিমা ময়ূরের পেখমের মতো নীল।


Read Online
pdf